Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাহানুমা তাছমিন

রোলঃ ২৩১০০১২০৮২২

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাহানুমা তাছমিন

রোলঃ ২৩১০০১২০৮২২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাহানুমা তাছমিন, আইডিঃ ২৩১০০১২০৮২২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাহানুমা তাছমিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

রাহানুমা তাছমিন

আইডিঃ ২৩১০০১২০৮২২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা.....1

১.১: বিষয়ের পটভূমি.....1

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য.....2

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব.....3

অধ্যায় ২: ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা.....3

২.১ ইসলাম আগমনের পূর্বে বিভিন্ন সমাজে ও মতে নারীর অবস্থান.....4

২.২ নারীর অধিকার ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা.....8

২.২.১ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীর অধিকার.....9

২.২.২ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অধিকার.....20

২.২.৩ শিক্ষাগত অধিকার.....23

২.২.৪ আইনগত অধিকার.....25

২.২.৫ অর্থনৈতিক অধিকার.....30

২.২.৬ বৈবাহিক অধিকার:.....35

২.২.৭ রাজনৈতিক অধিকার:.....41

২.৩ নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামে পর্দা ও হিজাবের ভূমিকা.....43

২.৩.১ নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রম সংরক্ষণ.....44

২.৩.২ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ.....44

২.৩.৩ আত্মমর্যাদা ও শালীনতা রক্ষা.....45

২.৩.৪ সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানজনক উপস্থিতি.....46

২.৩.৫ সাহাবী নারীদের জীবনে পর্দার বাস্তব প্রয়োগ.....46

অধ্যায়:৩: নারীবাদ: প্রেক্ষাপট ও বিবর্তন.....48

৩.১ নারীবাদের ধারণা ও এর প্রেক্ষাপট.....48

৩.১.১ নারীবাদের ধারণা: 48

৩.১.২ নারীবাদ মতাদর্শ: 48

৩.১.৩ নারীবাদী আন্দোলনের ধারা: 49

৩.১.৪ জাতিসংঘ-ব্যবস্থায় নারীবাদ: 51

৩.১.৫ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীবাদ:..53

৩.২ নারীবাদের বিভিন্ন মতবাদ: 54

৩.৩ আধুনিক নারীবাদের মূল দাবি ও দর্শন...56

৩.৪ পাশ্চাত্য সমাজে নারীবাদের প্রভাব ও তার বাস্তবতা 58

অধ্যায়:৪: ইসলাম ও নারীবাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ...62

৪.১ ইসলাম বনাম নারীবাদের মূল পার্থক্য 62

৪.২ ইসলামে নারীর অধিকার বিষয়ে প্রচলিত বিভ্রান্তি ও তার বাস্তবতা.........................64

অধ্যায়:৫: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ..70

৫.১ মুসলিম বিশ্বে নারীবাদের সূচনা ও বিস্তার...70

৫.১.১ পাশ্চাত্য নারীবাদ ও ইসলামী নারীবাদ:...71

৫.১.২ ইসলামী নারীবাদ যেভাবে একজন মানুষকে কুফর ও রিদ্দাহর দিকে ধাবিত করে:73

৫.২ মুসলিম বিশ্বে নারীবাদের কুপ্রভাব...75

৫.৩ আধুনিক যুগে মুসলিম নারীর প্রকৃত সমস্যাসমূহ..77

৫.৪ আধুনিক যুগে মুসলিম নারীর সংকট মোকাবিলায় করণীয়......................................81

অধ্যায়:৬: উপসংহার..85

৬.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ...85

তথ্যসূত্র 86

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১: বিষয়ের পটভূমি

ইসলাম সর্বকালের মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্ প্রদর্শিত জীবন দর্শন, জীবনাদর্শ ও পথ নির্দেশিকা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَام

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম" (সূরা আল-ইমরান: ১৯)। এই শাশ্বত আদর্শের পরশেই নারী সমাজ ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো গৌরব ও মানবিক মর্যাদা। মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারী জাতি আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত এবং পুরুষের জীবনসঙ্গিনী হিসেবে জীবন পরিচালনার অপরিহার্য অংশীদার।

ইসলাম পূর্ববর্তী সময়ে যখন বিশ্বজুড়ে নারী সমাজ ছিল চরম অবহেলিত, নিগৃহীত এবং অধিকারবঞ্চিত; যখন বিশেষ করে আরব ও ইউরোপীয় সমাজে তাদের মানুষ হিসেবে নূন্যতম স্বীকৃতিটুকুও দেওয়া হতো না, ঠিক সেই অন্ধকার যুগে ইসলাম নারীর যথাযোগ্য অধিকার ও সম্মান নিশ্চিত করে তাদের আসীন করেছে মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে। পবিত্র কুরআনে নারী-পুরুষের এই নিবিড় ও গভীর সম্পর্ককে অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রিত করা হয়েছে,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن ّ

‘তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক’ (সূরা আল-বাক্বারাহ ১৮৭)। এই আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী, নারী ও পুরুষ একে অপরের রক্ষক, সৌন্দর্য এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম নারী ও পুরুষকে একই উৎস থেকে সৃষ্ট ঘোষণা করে লিঙ্গবৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبا-ً

‘হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ’তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ’তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ’তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ’তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন’। (সূরা আন-নিসা ১)

প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম নারীকে কেবল অধিকারই দেয়নি, বরং পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে দিয়েছে এক অনন্য স্বকীয়তা।

অন্যদিকে আধুনিক যুগে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে "নারীবাদ" (Feminism) নামে একটি মতবাদ গড়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে এটি নারীর প্রতি বৈষম্য ও সামাজিক বঞ্চনার প্রতিবাদ হিসেবে আবির্ভূত হলেও সময়ের সাথে সাথে এর বহু ধারা পরিবার, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নারী-পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্য সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করে। ফলে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী অধিকার ও আধুনিক নারীবাদী চিন্তার মধ্যে একটি মৌলিক আদর্শিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তি, অপপ্রচার ও সমালোচনা বিদ্যমান। বিশেষ করে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের পর্দা, পারিবারিক কাঠামো ও নারী-পুরুষের দায়িত্ববণ্টনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। অথচ ইসলাম নারীকে কেবল অধিকারই দেয়নি; বরং তাকে একটি মর্যাদাপূর্ণ, সুরক্ষিত ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছে। বর্তমান সময়ের তথাকথিত নারীবাদী চেতনার ভিড়ে ইসলামের এই মৌলিক ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা অপরিহার্য।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

- ইসলামে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা উপস্থাপন করা।
- ইসলাম আগমনের পূর্বে বিভিন্ন সভ্যতায় নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করা।
- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ বিশ্লেষণ করা।
- পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত ক্ষেত্রে ইসলামে নারীর অধিকার তুলে ধরা।
- আধুনিক নারীবাদের উৎপত্তি, বিকাশ ও মূল দর্শন বিশ্লেষণ করা।
- ইসলাম ও নারীবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যসমূহ তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করা।
- ইসলামের বিরুদ্ধে নারীর অধিকার বিষয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা ও তার সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা।

- মুসলিম সমাজে নারীবাদের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা।
- আধুনিক যুগে মুসলিম নারীর প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তার সমাধান উপস্থাপন করা।
- ইসলাম নারীকে যে ভারসাম্যপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছে, তা তুলে ধরা।

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামে নারীর অবস্থান সম্পর্কে নানা ভুল ধারণা, অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। তাই এ বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই গবেষণার গুরুত্ব নিম্নরূপ—

- ইসলামে নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করবে।
- ইসলাম নারীকে অবমূল্যায়ন করে—এ ধরনের প্রচলিত অপপ্রচারের জবাব দিতে সহায়তা করবে।
- মুসলিম সমাজে বিদ্যমান কিছু কুসংস্কার ও ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা চিহ্নিত করতে সহায়ক হবে।
- ইসলাম ও নারীবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করবে।
- নারীর অধিকার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করবে।
- মুসলিম নারীদের নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।
- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা অনুধাবনে সহায়তা করবে।
- আধুনিক ভোগবাদী ও বস্তুবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে সৃষ্ট নারীবিষয়ক সংকট বিশ্লেষণে ভূমিকা রাখবে।
- ইসলামী সমাজব্যবস্থার সৌন্দর্য ও বাস্তবমুখী দিকগুলো তুলে ধরবে।

অধ্যায় ২: ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

২.১ ইসলাম আগমনের পূর্বে বিভিন্ন সমাজে ও মতে নারীর অবস্থান

গ্রীসে নারীর অবস্থা

প্রাচীন গ্রীক সমাজের নারীকেই প্রথম সভ্য নারী বলা চলে। তারা সতীসাধ্বী ছিল এবং গৃহের বাইরে বেরুত না। যাবতীয় কাজ তারা বাড়ীর ভেতরেই সমাধা করতো। কিন্তু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল, ফলে সাধারণ সমাজ জীবনে তারা কোন অবদান রাখতে পারতো না। সমাজে তারা এত ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুণ্ডা মনে করা হতো। শুধুমাত্র অভিজাত পরিবারগুলোতে পর্দার প্রচরণ ছিল। তবে আইনগতভাবে নারী ছিল সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মত। বাজারে তার বেচাকেনা চলতো। যেসব ব্যাপারে নারীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠতো, সেখানে তার কোনই স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিলনা। গ্রীকরা নারীকে উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছিল। সারা জীবন তারা পুরুষের দাসীবাদীর ন্যায় জীবন জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। তাদের বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে পুরুষদের এখতিয়ারাধীন ছিল। পুরুষরা নারীদের জন্য যে স্বামী পছন্দ করতো, সেই স্বামীই তাদের বরণ করে নিতে হতো। পুরুষরাই নারীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতো। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী নিজের সম্পত্তি ভোগদখল ও হস্তান্তর করতে পারতো না। সেই সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার ছিল পুরুষের একচেটিয়া। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাওয়ার অধিকারও নারীকে দেওয়া হতো না।

রোমান সমাজে নারী:

প্রাচীন রোমান সমাজে পরিবারের প্রধান (পিতা) ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সন্তান জন্মের পর পিতা তাকে গ্রহণ না করলে সে পরিত্যক্ত হতো এবং মৃত্যুর মুখে পড়তো। পিতা চাইলে সন্তানকে বিক্রি বা পরিবার থেকে বহিষ্কার করতে পারতো। ছেলে কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পেলেও মেয়েরা আজীবন পিতার অধীন থাকতো।

পরিবারের সকল সম্পত্তির মালিক ছিল পরিবারপ্রধান; নারী কোনো সম্পত্তির অধিকারী ছিল না। পরবর্তীতে কিছু আইনি পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীরা সীমিতভাবে সম্পত্তির অধিকার পায়, তবে নিয়ন্ত্রণ মূলত পুরুষের হাতেই থাকতো।

বিয়ের পর নারীর ওপর স্বামীর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতো। নারী কখনো স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়নি; বরং অভিভাবকের অধীনে থাকতে হতো।

রোমান আইনে নারীকে নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে দুর্বল ও অযোগ্য মনে করা হতো, এবং দাস ও বিদেশীদের মতোই তাদের অধিকার সীমিত ছিল। পরবর্তীতে কিছু উন্নতি হলেও নারীরা পূর্ণ অধিকার অর্জন করতে পারেনি।

হামুরাবীর আইনে নারী

হামুরাবীর আইনে নারীকে গৃহপালিত জীবজন্তুর পর্যায়ে ফেলা হতো। এ কারণে কেউ কারো মেয়েকে হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ঐ মেয়ের বাবার কাছে হত্যাকারীর নিজের মেয়েকে চিরতরে হস্তান্তর করতে হতো। সে ঐ মেয়েকে হত্যা করুক বা দাসী হিসেবে রেখে দিক, সেটা তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

হিন্দু মতে নারী

প্রাচীন হিন্দু মনীষীরা এই মত পোষণ করতো যে, মানুষ যাবতীয় সাংসারিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন না করা পর্যন্ত তার পক্ষে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা অর্জন করা সম্ভব নয়। মনু সংহিতায় পিতা, স্বামী অথবা নিজ পুত্রের কর্তৃত্ব থেকে নারীর স্বাধীন হবার কোন অধিকার নেই। এই তিনজন মারা গেলে তাকে তার স্বামীর কোন এক পুরুষ নিকটাত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। সারা জীবন তাকে অধিকারহীনা অবস্থায় কাটাতে হয়। এমনকি এক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিলনা। তাকে স্বামীর সাথে একই চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো। **১৭শ** শতাব্দী পর্যন্ত এই সতিদাহ প্রথা চালু থাকে। এরপর এই প্রথা বিলোপ করা হলেও হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের তা মনোপুত ছিলনা। কোথাও কোথাও নারীকে দেবতার তুষ্টি সাধন অথবা কৃষি ও ভালো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো।

ভারতের কোন কোন অঞ্চলে একটি বিশেষ গাছের গোড়ায় প্রতি বছর একটি করে যুবতী মেয়েকে বলি দেয়ার রেওয়াজ চালু আছে।

কোন কোন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা আছে: বিষ, সাপ, আগুন, মৃত্যু, নরক ও ঝড় বন্যা- এসব কোন কিছুই নারীর চেয়ে খারাপ নয়।

প্রাচীন জাতিসমূহের প্রবাদ বচনে নারী

একটি চীনা প্রবাদে আছে: "তোমরা স্ত্রীর কথা শোন, তবে বিশ্বাস করোনা।"

একটি রুশ প্রবাদে আছে: "দশটি নারীর মধ্যেও একটির বেশী আত্মা থাকেনা।"

একটি স্পেনীয় প্রবাদে বলা হয়েছে: ‘‘দুষ্টা নারীকে এড়িয়ে চল। তবে বিদুষী নারীর প্রতিও ঝুকে পড়োনা’’।

একটি ইটালীয় প্রবাদে বলা হয়েছে: ‘‘ঘোড়া চটপটে বা অলস যাই হোক, তাকে চালাতে চাবুক ব্যবহার কর। আর নারী সতীই হোক আর অসতীই হোক- তাকে ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা কর।"

ইহুদি সমাজে নারী

ইহুদী সমাজের কিছু গোষ্ঠীতে নারীর অবস্থান দাসীর মতো ছিল। পিতা চাইলে মেয়েকে বিক্রি করতে পারতো। সাধারণত পুত্র সন্তান না থাকলেই কন্যা উত্তরাধিকার পেত; পুত্র থাকলে কন্যা বঞ্চিত হতো এবং বিয়ের সময় কিছু সম্পদ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হতো।

ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, কন্যা ভাইদের সাথে উত্তরাধিকার পেত কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে; অন্যথায় ভাইয়েরাই সম্পত্তির মালিক হতো। অস্থাবর সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার প্রায় থাকতো না। এমনকি কন্যা উত্তরাধিকার পেলেও শর্ত থাকতো যে, সে নিজ গোত্রের বাইরে বিয়ে করতে পারবে না, যাতে সম্পত্তি অন্য গোত্রে না যায়।

এ ছাড়া ইহুদীরা সচরাচর নারীকে অভিশাপ মনে করে থাকে। কারণ নারীই আদমকে বিপথগামী করেছিল। তাওরাতে বলা হয়েছে: "স্ত্রীলোক মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক।

খৃস্ট সমাজে নারী

প্রথম যুগের খ্রিস্টীয় সমাজে ধর্মযাজকরা রোমান সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য নারীদের দায়ী করেন এবং নারী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা প্রচার করেন। তারা বিয়েকে নিকৃষ্ট কাজ হিসেবে দেখতেন এবং নারীকে শয়তানের প্রবেশদ্বার হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। কিছু যাজক নারীদের বিপজ্জনক ও বিভ্রান্তিকর সত্তা হিসেবে বর্ণনা করেন।

পঞ্চম শতাব্দীতে নারীর আত্মা আছে কি না—এ নিয়েও বিতর্ক হয়, এবং নারীর মর্যাদা প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ইউরোপীয় সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব পড়ে, যেখানে

নারীকে মানুষের মর্যাদা দেওয়া হলেও তাকে মূলত পুরুষের সেবার জন্য সৃষ্টি বলা হয়।

মধ্যযুগ পর্যন্ত নারীরা সামাজিক ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তারা সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারতো না। এমনকি পরবর্তীকালে কিছু দেশে স্বামীর স্ত্রী বিক্রির মতো অমানবিক প্রথাও দেখা গেছে, যা পরে আইন করে বন্ধ করা হয়।

ফরাসী বিপ্লবের পরও নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি; আইন অনুযায়ী নারীকে শিশু ও মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের সাথে তুলনা করে সীমিত অধিকার দেওয়া হয়। পরে ধীরে ধীরে এসব আইনের পরিবর্তন ঘটে, তবে দীর্ঘ সময় নারীরা অধিকারবঞ্চিত অবস্থায় ছিল।

তৎকালীন আরবের জাহেলি সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থা

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান ছিল দাসী কিংবা ভারবাহী পশুর মতো, যাদের যথেচ্ছভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। একজন স্বামী চাইলেই অগণিত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত এবং প্রয়োজনে স্ত্রীকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেওয়া কিংবা ঋণের দায়ে হস্তান্তর করার মতো অমানবিক প্রথাও প্রচলিত ছিল। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াকে সে সময় অত্যন্ত লজ্জাজনক মনে করা হতো; ফলে অনেক পাষাণ পিতা তাদের নিষ্পাপ কন্যা শিশুকে জীবন্ত সমাধিস্থ করতেও কুণ্ঠিত হতো না। জাহেলি যুগের এই চরম বিবেকবর্জিত ও নৃশংস কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করে বলেন:

وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে—কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?" (সূরা আত তাকভীর: ৮-৯)

সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রেও নারী ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। পিতা-মাতা কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের কোনো অংশ দেওয়া হতো না। এমনকি পিতৃহীনা বিত্তশালী বালিকাদের ওপর অভিভাবকরা এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করত যে, তারা না পারত সম্মানজনক মোহরানা পেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে, না পারত অন্যত্র সংসার গড়তে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ছিল এই যে, তৎকালীন সমাজে সুন্দরী দাসীদের দিয়ে দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জনের মতো জঘন্য অপরাধও প্রচলিত ছিল। এই ঘৃণ্য প্রথা নির্মূলে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করেন:

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"আর তোমরা পার্থিব সম্পদের লালসায় তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না, যখন তারা পবিত্র থাকতে চায়।" (সূরা আন নূর: ৩৩)

তবে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও আরব নারীদের একটি গর্বের জায়গা ছিল। তৎকালীন পুরুষরা নারীর জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করতে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করত এবং নারীর অবমাননার প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হতো না। এই বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সাহসিকতার দিক দিয়ে আরব নারীরা তৎকালীন বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের নারীদের তুলনায় এক অনন্য শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল।

জাহেলি যুগের এই অমাবস্যার আঁধার ফুঁড়েই ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছিল, যা নারীকে কেবল পণ্য বা সম্ভ্রম রক্ষার বস্তু হিসেবে নয়, বরং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও সম্মানের অধিকারী হিসেবে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

২.২ নারীর অধিকার ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ—উভয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়কেই মানবিক মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। মানব সৃষ্টির সূচনায় তিনি আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাঁদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তার ঘটান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি'। (সূরা আল হুজুরাত: ১৩)।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ উভয়েই মানবজাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উভয়েই সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারের দাবিদার। মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করে বলেন—

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً

'আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি'। (সূরা আল বনী ইসরাঈল: ৭০)

জাহেলী যুগে নারী সমাজ ছিল অবহেলিত, নির্যাতিত ও অধিকারবঞ্চিত। নারীকে কখনো ভোগের বস্তু, কখনো সম্পত্তি, আবার কখনো সামাজিক বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ইসলাম আগমনের মাধ্যমে এই অমানবিক অবস্থার অবসান ঘটে এবং নারীকে প্রদান করা হয় ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা, শিক্ষা, সম্পদ, বিবাহ, উত্তরাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার। ইসলাম নারীকে কেবল পুরুষের অধীনস্ত সত্তা হিসেবে নয়; বরং সম্মানিত মানবসত্তা, পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামে নারীর প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদার বিভিন্ন দিক নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো।

২.২.১ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীর অধিকার

মা হিসেবে অধিকার:

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম বা মতবাদে নারীকে মা হিসেবে এত মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হয়নি। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন—

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ حَمْلُهُ وَ فِصَلُهُ ثَلْثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَ عَلَى وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিলাম। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করলো এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করলো। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগলো, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান করুন যাতে আমি আপনার নেয়ামতের শোকর করি, যা আপনি দান কলেন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করুন, আমি আপনার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।" -(সূরা আল আহক্বাফ: আয়াত-১৫)

আয়াতের শুরুতে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য হলো, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভধারণের সময়ের কষ্ট, প্রসববেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাকেই সহ্য করতে হয়। পক্ষান্তরে পিতাকে এসবের কিছুই সহ্য করতে হয় না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের উপর মাতার হক্ক বেশি রেখেছেন।

হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাহচর্যে আমার সদাচার পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারী কে? তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার মা’। লোকটি বললেন, তারপর কে? তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার মা’। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার মা’। লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার বাবা’। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার বাবা, তারপর তোমার নিকট আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব’। (সহীহ বুখারী, হা/৫৯৭১; সহীহ মুসলিম, হা/২৫৪৮; মিশকাত, হা/৪৯১১।)

হাদীছে বর্ণিত আছে, এক সাহাবী আরজ করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে গমন করতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মা আছেন? সাহাবী বললেন, আছেন। তখন তিনি বললেন, যাও তার কাছে বসে থাকো, কেননা জান্নাত তার পায়েরই কাছে”। (মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৯; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১৩/৮০)

অন্য বর্ণনায় আছে, ‘জান্নাত হলো মায়েদের কদমের নীচে।’ (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ৭৩৩০)

আল্লাহ তা’আলা কুরআনুল কারিমে ঘোষণা করেন-

وَقَضَى رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে, তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের 'উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলো। তাদের সামনে ভালোবাসার

সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলো, হে আমাদের পালনকর্তা। তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করুন যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন পালন করলেন।" (সূরা আল বনী ইসরাঈল: আয়াত-২৩-২৪)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, পিতা মাতা উভয়ে জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সাথে সর্বদা সদাচরণ করতে আল্লাহ তা আলা সরাসরি নির্দেশ দেন। ধমক তো নয়ই কিংবা বিরক্তর সুরে উহ শব্দটিও উচ্চারণ করা জায়েজ নেই। তাদের সাথে সর্বদা নম্র ও বিনীত আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে ইসলামে বাবার সাথে সাথে মায়ের সম্মান ও মর্যাদা কতটা বেশি এবং তাদের প্রতি সদাচরণ ও তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র ঘোষণা করেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ.

"আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জন্য জোর নির্দেশ দিলাম। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করলো। তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয়। নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।" (সূরা আল লুকমান: আয়াত-১৪)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে মায়ের ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যা তাকে বাবার চেয়েও এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। আল্লাহ এখানে মায়ের তিনটি বিশেষ ত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন— গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসব বেদনা এবং দুগ্ধদানের পরিশ্রম। এই কষ্টগুলো বাবা ভাগ করে নিতে পারেন না, তাই কৃতজ্ঞতার তালিকায় আল্লাহর পরেই মা-বাবার স্থান দেওয়া হয়েছে। 'শুকর গুজার' বা কৃতজ্ঞ হওয়া কেবল মৌখিক নয়, বরং কাজের মাধ্যমে মায়ের সেবা করে তা প্রমাণ করতে হবে। যেহেতু মা 'কষ্টের পর কষ্ট' সহ্য করেছেন, তাই কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী সন্তানের সেবা ও সাহচর্যের ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার বাবার চেয়ে তিনগুণ বেশি।

স্ত্রী হিসেবে অধিকার:

ইসলাম একজন নারী যখন কারো স্ত্রী হয়, তখন তাকে স্ত্রী হিসেবে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া ও তার যাবতীয় অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বামীদের নির্দেশ দেয় এবং স্বামীর ওপর তার কিছু অধিকার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়।একজন স্ত্রীর সাথে

উত্তম আচরণ করা, লেবাস পোশাক, বরণ পোষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। তাদের সাথে বিনম্র ও কোমল ব্যবহার করা, তাদের বিষয়ে সহনশীল হওয়া এবং অহেতুক তার সাথে দুর্ব্যবহার না করা। তাদের ব্যবহারের ওপর ধৈর্য্য ধারণ করা। একজন স্বামীর ওপর কর্তব্য হলো, সে তার স্ত্রীকে দীন শেখাবে, তার সম্ভ্রমের হিফাযত করতে যথা সাধ্য চেষ্টা করবে। তারা যাতে কোনো প্রকার ঘরের বাইরে যেতে না হয়, তা জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করবে। তার সাথে কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করবে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

“আর তোমরা তাদের সাথে সদভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রাখবেন।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯)

এখানে আল্লাহ তা‘আলা শুধু স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ দেননি; বরং বৈবাহিক জীবনের মূলনীতি হিসেবে দয়া, সহমর্মিতা, ধৈর্য ও সম্মানকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

“কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে। তার কোনো একটি স্বভাব অপছন্দ হলে অন্য একটি স্বভাবে সন্তুষ্ট হবে।”

(সহিহ মুসলিম, কিতাবুর রদা‘ ;হাদিস নং: ১৪৬৯)

এ হাদিস স্বামীকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সহনশীলতা শেখায়।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে হাসি-আনন্দ করতেন, তাদের অনুভূতির মূল্য দিতেন এবং কোমল আচরণ করতেন। তিনি বলেন—

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম।”

(জামে তিরমিযী; হাদিস নং: ৩৮৯৫)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন। তিনি কখনো স্ত্রীদের প্রতি কঠোর বা অপমানজনক আচরণ করেননি।

যেমন, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

استوصوا بالنساء خيراً، فإنَّ المرأة خُلقت من ضلعٍ أعوج، وإنَّ أعوج شيءٍ في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

“আর তোমরা নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার কর। কারণ, নারীদের পাঁজরের বাম হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বাঁকা হাড় হলো, উপরি ভাগ। যদি তাকে ঠিক করতে যাও তাহলে তুমি ভেঙ্গে ফেললে আর যদি তুমি তাকে দিয়ে সংসার করতে চাও তাহলে বাঁকা অবস্থাতেই তোমাকে তার সাথে ঘর সংসার করতে হবে।” (সহিহ বুখারী আদাবুল মুফরিদ: ৩৩৩১; সহিহ মুসলিম: ১৪৬৮)

এই হাদীসের মূল শিক্ষা হলো—নারীর স্বভাব, আবেগ ও মানসিক গঠন পুরুষের তুলনায় ভিন্ন। ইসলাম পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছে, স্ত্রীর এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝে ধৈর্য, সহনশীলতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে আচরণ করতে।

এখানে “বাঁকা পাঁজরের হাড়” দ্বারা নারীকে হেয় করা উদ্দেশ্য নয়; বরং বোঝানো হয়েছে যে নারীর প্রকৃতিতে কোমলতা, আবেগপ্রবণতা ও সংবেদনশীলতা রয়েছে। তাই কঠোরতা বা জবরদস্তি দিয়ে তাকে পরিবর্তন করতে গেলে সংসার ভেঙে যেতে পারে।

আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أكملُ المؤمنين إيماناً أحسنُهم خلقاً، وخيارُكم خيارُكم لنسائهم

“মুমিনদের মধ্যে পুরোপুরি ঈমানদার হলো তোমাদের মধ্যে যারা আখলাকের দিক দিয়ে উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।” (সহিহ মুসলিম: ৫৭/১০)

ইমাম মুসলিম তার সহীহ-তে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন:

فاتّقوا الله في النساء، فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكم عليهنَّ أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهنَّ ضرباً غير مبرّح، ولهنَّ رزقهنّ وكسوتهنَّ بالمعروف

“নারীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর! কারণ, তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ, আর আল্লাহর বাণীর দ্বারাই তোমরা তাদের হালাল করেছ। তাদের ওপর তোমাদের বিষয়ে দায়িত্ব হলো, তারা খেয়াল রাখবে যাতে তোমাদের বিছানায় এমন কোনো লোক না অবস্থান করে যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এ ধরনের কোনো কাজ করে তোমরা তাদের প্রহার কর। তবে তা হবে সহনীয় পর্যায়ে অমানবিক নয়। তাদের জন্য তোমাদের দায়িত্ব তোমরা তাদের রিযিক দেবে ভরণ পোষণ দেবে উত্তম উপায়ে।” (সহিহ মুসলিম: ১২১৮)

কন্যা হিসেবে অধিকার:

কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা অধিক। ইসলাম কন্যা সন্তানদের প্রতি দয়া করা, তাদের নৈতিক শিক্ষা দেয়া, আদর যত্নসহকারে লালন-পালন করা এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে নেককার নারী হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। পক্ষান্তরে জাহেলিয়্যাতের যুগে যে সব কাফির মুশরিকরা কন্যা সন্তানের জন্মকে অপছন্দ করত, তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ- يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ◌َ

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে মর্মাহত হয়ে পড়ে। তাকে যে বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হ'ল তার লজ্জায় লোক সমাজ হ'তে পালিয়ে বেড়ায়, অপমান সয়ে তাকে রাখবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? শুনে রাখ! তাদের এই ব্যবস্থা নিতান্ত জঘন্য"। (সূরা আন-নাহল ৫৮-৫৯)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে মুগিরা ইবন শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إنَّ الله حرّم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর মাতা-পিতার নাফরমানী করাকে হারাম করেছেন, ভিক্ষা করা ও কন্যা সন্তানদের পুতে হত্যা করাকে হারাম করেছেন।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৫৯৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- **১৭১৫**)

হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেন, জাহেলি যুগের লোকেরা কন্যা সন্তানদের দু'টি পদ্ধতিতে হত্যা করত:

এক. তারা তাদের স্ত্রীদের যখন সন্তান প্রসবের সময় হত, তখন তারা তাদের নির্দেশ দিয়ে বলত, তারা যেন একটি গুহার নিকট চলে যায়। তারপর যখন কোনো পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করত, তখন তাকে জীবিত রাখত। আর যখন কোনো কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করত, তখন তাকে গর্তে নিক্ষেপ করে হত্যা করে ফেলত।

দুই. যখন তাদের কন্যা সন্তানদের বয়স ছয় বছর হত, তখন তারা তাদের সন্তানের মাকে বলত, তাকে তুমি সাজিয়ে দাও! আমি তাকে নিয়ে আমার আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যাব। মা তাকে সাজিয়ে দিলে, তার পিতা তাকে নিয়ে গভীর বন-জঙ্গলে চলে যেত এবং কুপের নিকট এসে তাকে বলত, তুমি একটু নিচের দিকে তাকিয়ে দেখ, সে যখন নিচের দিকে তাকিয়ে দেখত, তখন তাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে কুপের

মধ্যে ফেলে দিত। তারপর মাটি চাপা দিয়ে অথবা পাথর মেরে হত্যা করে ফেলত। এ ভাবেই তাদের মধ্যে কন্যা সন্তানদের হত্যা করার ধারাবাহিকতা যুগ যুগ ধরে চলছিল। ইসলামের আগমনের পর ইসলাম নারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে বড় একটি নি'আমত হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং কন্যা সন্তানদের হত্যা করার প্রবণতা বন্ধ করে দেয় এবং ঘোষণা দেয় যে , কন্যা সন্তান হত্যা করা জঘন্য অপরাধ। কারণ, কন্যা সন্তান জন্ম কোনো মানুষের কর্মের ফল নয়, বরং তাও আল্লাহর দান। আল্লাহ যাকে চান কন্যা সন্তান দেন আবার যাকে চান পুত্র সন্তান দেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُور
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۤءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْر

অর্থ: "আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান"। (সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৪৯-৫০)

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله تعالى الجنّة

"কোনো ব্যক্তির যদি একজন কন্যা সন্তান থাকে এবং সে তাকে হত্যা করে নি, কোনো প্রকার অবহেলা করেনি এবং পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের ওপর কোনো প্রকার প্রাধান্য দেয়নি। আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (মুসনাদে আহমদ: ২২৩/১)

ইবন মাজাহ উকবা ইবন আমের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

من كان له ثلاث بناتٍ وصبر عليهنَّ، وكساهنَّ من جِدَته، كنَّ له حجاباً من النار

"যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান থাকবে এবং সে তাদের লালন- পালনে ধৈর্য্য ধারণ করে ও তাদের ভালো কাপড় পরায়, তখন তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।" (ইবনে মাজাহ: ৩৬৬৮)

জাহেলী যুগের প্রথাকে নির্মূল করে কন্যাসন্তান জন্মকে কল্যাণময় ও বড় সৌভাগ্যের বিষয় হিসাবে অভিহিত করত, শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন মহানবী সসল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَه.

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত দু'টি কন্যার লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করে, তাহ'লে আমি ও সেই ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন এভাবে একত্রে থাকব'। এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে ধরলেন। (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩)

বোন, ফুফু, খালা হিসেবে অধিকার:

ইসলাম বোন, খালা ও ফুফুদের সাথে উত্তম ব্যবহার, তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা এবং তাদের অধিকার বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশ দেয়। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও তাদের সহযোগিতা করার কারণে তাদের অনেক সওয়াব ও বিনিময় দেয়ার কথাও ইসলাম ঘোষণা করে।

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদে এবং ইবন মাজাহ মিকদাম ইবন মাদি কারাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন,

إنَّ اللهَ يوصيكم بأمّهاتكم، ثمَّ يوصيكم بأمّهاتكم، ثمَّ يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাতাদের বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করেন, তারপর আবারো তিনি তোমাদের মাতাদের বিষয়ে উপদেশ দেন, তারপর তিনি তোমাদের পিতাদের বিষয়ে উপদেশ দেন। তারপর যারা তোমাদের অতি কাছের আত্মীয় তাদের বিষয়ে, তারপর যারা তোমাদের কাছের আত্মীয় তাদের বিষয়ে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৬)

ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا يكون لأحدٍ ثلاث بناتٍ، أو ثلاث أخوات فيحسن إليهنَّ إلاَّ دخل الجنّة

"যদি কোনো লোকের তিনটি কন্যা সন্তান অথবা তিনজন বোন থাকে, তারপর সে তাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করে লালন-পালন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (তিরমিযী, হাদীস নং ১৯১২; আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৪)

সহীহ বুখারী মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الرحم شجنةٌ من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله

“আত্মীয়তা হলো, আল্লাহর পক্ষ হতে একটি বন্ধন, যে ব্যক্তি তার সম্পর্ককে অটুট রাখে আল্লাহ তা‘আলা তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে, আর যে তার সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ তা‘আলা তার সাথে সম্পর্ককে চিহ্ন করে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৫)

সহীহ বুখারী মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من أحبَّ أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه

“যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য তার রিযিকের মধ্যে বরকত দান করুক এবং তার ধন সম্পত্তি আরও বাড়িয়ে দিক, সে যেন আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে এবং নিকট আত্মীয়দের সাথে কোনো ভাবে সম্পর্ক নষ্ট না করে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৭)

এমনকি যদি কোনো নারী অপরিচিতও হয়ে থাকে- তার সাথে কোনো আত্মীয় বন্ধন না থাকে, সেও যখন কোনো বিপদে পড়ে অথবা তার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তাকেও সহযোগিতা করার প্রতি ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে করীমে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাদীসে এ ধরনের অসহায় নারী ও পুরুষদের সহযোগিতা করা এবং তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেন এবং নারীদের সহযোগিতা করার ওপর আল্লাহ তা‘আলা অনেক সাওয়াব ও বিনিময় ঘোষণা করেন।

সহীহ বুখারী মুসলিমে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر

“অসহায় দরিদ্র লোক ও বিধবা স্ত্রীলোকের সহযোগিতা করা, আল্লাহর রাহে জিহাদ করার নামান্তর। অথবা বিরামহীন রাত জেগে ইবাদতকারীর মতো অথবা সে সাওম পালনকারীদের মতো যে কখনো সাওম ভঙ্গ করে না।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৮২)

মতামত ও পরামর্শ প্রদানের অধিকার:

ইসলাম নারীদের থেকে পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারেও মতামত ও পরামর্শ গ্রহণকে গুরুত্ব দিয়েছে। পরিবার ও সমাজের কল্যাণে তাদের কল্যাণধর্মী মতামত ও পরামর্শ গ্রহণে ইসলাম উৎসাহ্ প্রদান করেছে। হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু নবীজির কর্ম পদ্ধতি প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন-

“প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীদের সাথেও পরামর্শ করতেন। কোন কোন সময় তারা এমন পরামর্শ দিতেন যা তিনি গ্রহণ করতেন”। (ইবনে কুতাইবা, উয়ুনুল আখবার, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী খাদিজা রা. হতে বিভিন্ন সময় পরামর্শ চাইলে তিনি তাকে বলেছিলেন-

"আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবে না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখেন। সত্য কথা বলেন, অসহায় মানুষের সহায়তা করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ে সাহায্য করেন।"

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবীয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালমা রা. এর পরামর্শ গ্রহণ করে আমল করতে আরম্ভ করলে আল্লাহ তা 'আলা তার পরামর্শের মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দান করেন।

রাসূল(সা:) এর যুগে মুসলিম নারীদের সামাজিক অধিকার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী সমাজে নারীকে কেবল গৃহস্থালির সীমাবদ্ধ সত্তা হিসেবে দেখা হয়নি; বরং তাকে ঈমান, ইবাদত, জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের একজন সক্রিয় অংশীদার হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। নবী যুগের মুসলিম নারীরা ইসলামী আদর্শ ও শালীনতার সীমারেখা বজায় রেখে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এর মাধ্যমে ইসলাম নারীর সামাজিক অধিকারকে বাস্তব রূপ দেয় এবং নারীকে সমাজের একটি কার্যকর ও সম্মানিত শক্তিতে পরিণত করে।

ইবাদত ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ছিল মুসলিম নারীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকার। তারা নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামাআতে সালাত আদায় করতেন, বিশেষত ফজর ও এশার সালাতে অংশ নিতেন। জুমু‘আ, ঈদ ও কুসূফের সালাতেও তাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন:

“তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিও না।” — সহীহ বুখারী, হাদীস: ৯০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৪৪২।

রমযানের শেষ দশকে নারীরা মসজিদে ই‘তিকাফ করতেন এবং রাসূল ﷺ–এর স্ত্রীগণও এতে অংশগ্রহণ করতেন। ঈদের জামাআতে এমনকি কিশোরী ও ঋতুমতী নারীদেরও

উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা মুসলিম সমাজের সম্মিলিত কল্যাণ ও দ্বীনি পরিবেশে অংশ নিতে পারেন। — সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩২৪।

নবী যুগের মুসলিম নারীরা জ্ঞানচর্চা ও সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিলেন। তারা সরাসরি রাসূল ﷺ-এর নিকট বিভিন্ন মাসআলা ও ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন এবং প্রয়োজনে পুরুষ সাহাবীদের সংশোধনও করতেন। হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম প্রধান উৎস; বহু সাহাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীস, ফিকহ ও পারিবারিক জীবনের বিধান শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ইমাম যুহরী বলেন, "যদি আয়িশা (রা.)-এর জ্ঞান সকল নারীর জ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তাঁর জ্ঞানই অধিকতর প্রাধান্য পাবে।" — সিয়ার আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী।

এছাড়া মুসলিম নারীরা "আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার" তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্বও পালন করতেন, যা ইসলামে সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি মৌলিক নীতি।

সমাজকল্যাণ ও মানবসেবামূলক কাজেও নবী যুগের নারীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তারা মেহমানদের আপ্যায়ন করতেন, দরিদ্র ও মুহাজিরদের সহযোগিতা করতেন এবং সামাজিক সংহতি রক্ষায় ভূমিকা পালন করতেন। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) স্বামীর খেজুর বাগানের কাজকর্মে সহায়তা করতেন এবং নিজ হাতে খেজুর বহন করে আনতেন। — সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫২২৪।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী যয়নব (রা.) নিজ হাতে উপার্জন করে স্বামী ও ইয়াতীম সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। — সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৪৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০০০।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে নারীর বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পারিবারিক সহযোগিতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্র ও সমাজ রক্ষার ক্ষেত্রেও মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন যুদ্ধে তারা আহতদের সেবা, পানি সরবরাহ ও চিকিৎসার কাজে অংশ নিতেন। হযরত রুফাইদা আল-আসলামিয়্যা (রা.)-কে ইসলামের প্রথম নার্স হিসেবে অভিহিত করা হয়, যিনি আহত সাহাবীদের চিকিৎসা সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

"উম্মু সুলাইম ও অন্যান্য আনসারী নারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। তারা পানির মশক বহন করতেন এবং আহতদের পানি পান করাতেন ও সেবা করতেন।" — সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮১০

অন্য বর্ণনায় হযরত রুবাইয়্যি' বিনতে মুআওয়িয (রাঃ) বলেন—

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিতাম; আহতদের সেবা করতাম এবং শহীদ ও আহতদের মদীনায় ফিরিয়ে আনতাম।" — সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৮৮২

উহুদের যুদ্ধে হযরত উম্মে আম্মারা নুসাইবা বিনতে কা'ব (রা.) রাসূল ﷺ–কে রক্ষার জন্য সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। — ইবনে হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ।

এছাড়া উম্মে হারাম (রা.) নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলে রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দো'আ করেন। — সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৭৮৮।

সুতরাং, রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর হাতে গড়া সমাজে নারী ছিল না অবহেলিত বা নিষ্ক্রিয়; বরং তারা ছিল ঈমানি চেতনা, জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা ও মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ইসলামের নির্দেশিত শালীনতা ও নৈতিকতার সীমারেখা রক্ষা করে নারীরা সমাজে ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছেন। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম নারীকে অযৌক্তিকভাবে গৃহকেন্দ্রিক করে ফেলা হলেও তা নববী আদর্শ ও সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব কর্মপদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হলো—নারী তার মর্যাদা, পবিত্রতা ও ইসলামী মূল্যবোধ বজায় রেখে সমাজের কল্যাণ ও উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

২.২.২ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অধিকার

ইসলামের বিধান পালনের ক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষদের মত অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতি ইবাদতে সে অংশগ্রহণ করবে পুরুষের ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের আনুগত্য করে; তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (সূরা আত তওবা-৭১)।

ইসলামের বিধান পালনের ব্যাপারে সাওয়াবের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। বরং পুরুষ হোক আর নারীই হোক উভয়েই তাদের নিজ নিজ আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرا -ً

"পুরুষ অথবা নারীর কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না" (সূরা আন নিসা- ১২৪)

একজন নারী যদি কোন নেক আমল করে আল্লাহ তা'আলা তাকে একজন পুরুষের সমপরিমাণ সাওয়াব ও বিনিময় দিয়ে থাকেন। নারীকে নারী হওয়ার কারণে তার সাওয়াব ও মর্যাদায় কোন-ভাবেই কম দেয়া হয় না। এদিক থেকে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদার অধিকারী করা হয়েছে। নারী হওয়ার কারণে তার সাওয়াব ও বিনিময়ের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ও কম করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون(

"যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব"। (সূরা আন-নাহাল: ৯৭)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-

وَعَدَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ منَ الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم(

"আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহা-সফলতা। (সূরা আত-তাওবা: ৭২)

আল্লাহ তা আলা আরও বলেন-

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

“নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন”। (সূরা আল-আহযাব-৩৫)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলাম নারী ও পুরুষের মাঝে মানবিক মর্যাদা, ঈমানি পরিচয় ও আধ্যাত্মিক প্রতিদানের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করে না। নামাজ, রোজা, যাকাত, তাকওয়া, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, দানশীলতা— এসব মৌলিক দ্বীনি দায়িত্ব যেমন পুরুষের জন্য ফরজ, তেমনি নারীর জন্যও ফরজ। আল্লাহর কাছে মর্যাদার ভিত্তি লিঙ্গ নয়; বরং ঈমান ও আমল।

তবে ইসলামে নারীর স্বাভাবিক শারীরিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় ও সহজীকরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন— ঋতুকালীন সময়ে নারীদের নামাজ আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং সেই নামাজ পরে কাযাও করতে হয় না। রোজার ক্ষেত্রেও সাময়িক ছাড় রয়েছে, তবে পরে তা কাযা করে নেওয়ার বিধান রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুমিন নারীর মহান প্রতিদানের বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে বলেন-

إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت بعلها ؛ دخلت من أي أبواب الجنة شاءت

“যখন কোন নারী দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে রমজান মাসের রোজা রাখে, স্বীয় লজ্জা-স্থানের হিফাজত করে এবং সে তার স্বামীর অবাধ্য না হয়, সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা করে প্রবেশ করতে পারবে”।

এর অর্থ হচ্ছে, একজন মুমিন নারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথ একজন পুরুষের তুলনায় অধিক সহজ ও জান্নাতের দরজাসমূহ তাদের একেবারেই সন্নিকটে।

২.২.৩ শিক্ষাগত অধিকার

ইসলামে নারীর শিক্ষাগত অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত। ইসলাম যেভাবে পুরুষের উপর শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন ফরয করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি নারীদের উপরও তা সমানভাবে ফরয করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমদের তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন, যেখানে তিনি পুরুষ বা নারী কাউকেই আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করেননি। তিনি বলেছেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই ফরয।" এখানেও নর ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি; বরং উভয়ের উপরই সমানভাবে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মজিদের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতগুলোতেও জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ .

"পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহাদয়ালু, যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষকে তা শিখিয়েছেন যা সে জানত না।" (সূরা আল আলাক: ১–৫)

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে—যার মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত—জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। একইভাবে কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "যারা জানে (জ্ঞানী) আর যারা জানে না তারা কি সমান?" (সূরা আল জুমার: ৯)। এ প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের শিক্ষার ব্যাপারেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বহু হাদীসে তিনি নারী জাতিকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন। যেমন পুরুষরা তাঁর নিকট থেকে তা'লীম গ্রহণ করতেন, তেমনি নারীরাও শিক্ষা গ্রহণ করতেন। শুধু সম্ভ্রান্ত নারীদের নয়, বরং দাসীদের শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

“যে ব্যক্তি তার দাসীকে উত্তম শিক্ষা দেয়, উত্তম আদব শেখায়, অতঃপর তাকে মুক্ত করে বিবাহ করে, তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।” —সহীহ বুখারী, হাদিস: ৯৭; সহীহ মুসলিম

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

“কিছু নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, পুরুষরা আপনার নিকট শিক্ষা গ্রহণে আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তাই আপনি আমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করুন। তখন তিনি তাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করলেন এবং সে দিনে তাদের শিক্ষা দিতেন ও উপদেশ প্রদান করতেন।” — সহীহ বুখারী, হাদিস: ১০১; সহীহ মুসলিম

হাদিস ইসলামে নারীর শিক্ষাগত অধিকারের সবচেয়ে সুস্পষ্ট দলিলগুলোর একটি। এ হাদিস থেকে দেখা যায়, নারীরা নিজেরাই শিক্ষা লাভের দাবি উত্থাপন করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দাবি গ্রহণ করেছেন। তিনি নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষাসভার আয়োজন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নারী পণ্ডিতদের অন্যতম। বহু সাহাবি ও বিখ্যাত তাবেয়িগণ তাঁর নিকট থেকে হাদিস, ফিকহসহ বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে জালিলুল কদর সাহাবি হযরত আবু মূসা আল-আশ‘আরী (রা.) বলেন, “আমরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে হযরত আয়িশা (রা.)-এর শরণাপন্ন হতাম এবং তাঁর নিকট সঠিক সমাধান পেতাম।” তিনি ৭৭ জন সাহাবির উস্তাদ ছিলেন।

এ ছাড়া উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-ও ছিলেন সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমাদের একজন। ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী বলেন, “তিনি ৩২ জন সাহাবির উস্তাদ ছিলেন।” হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.), উম্মুদ দারদা (রা.) এবং হযরত আনাস (রা.)-এর মাতা উম্মে সুলাইম (রা.)-ও ছিলেন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইসলামী স্কলার। এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এসব ঘটনা সেই সময়ের, যখন নারীদের অনেক সমাজে ঘরের ব্যবহার্য বস্তু মনে করা হতো এবং কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো নৃশংস প্রথা প্রচলিত ছিল। এমন অন্ধকার যুগের বুক চিরে ইসলামের সোনালি সূর্যোদয় পুরুষের ন্যায় নারীকেও জ্ঞানের

আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করেছে। এর ফলেই ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছেন বহু মহীয়সী নারী।

সুতরাং ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়ের জন্যই সমভাবে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ প্রদান করেছে। কুরআন মানুষকে পড়তে, চিন্তা করতে, গবেষণা করতে এবং সৃষ্টিজগতের নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়। অতএব, জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং নারীরাও সমানভাবে এর পূর্ণ অধিকারী। ইসলাম প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে জীবনব্যাপী জ্ঞান অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করেছে।

২.২.৪ আইনগত অধিকার

জীবনের নিরাপত্তা ও কিসাসের ক্ষেত্রে অধিকার:

ইসলাম মানবজীবনের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। নারী হোক বা পুরুষ—উভয়ের জীবনই ইসলামী শরিয়তে সমান মর্যাদাসম্পন্ন। জাহেলী যুগে নারীর জীবনকে তুচ্ছ মনে করা হতো; অনেক ক্ষেত্রে নারীর হত্যার প্রতিশোধও গ্রহণ করা হতো না। ইসলামী আইনের বিধানে নারী এবং পুরুষ পরস্পর সমপর্যায়ের। ইসলামী শরিয়ত পুরুষ এবং নারীর জানমাল সুরক্ষায় সমান গুরুত্বারোপ করেছে। যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করে তাহলে কেসাসস্বরূপ তার মৃত্যুদণ্ড হবে। যেমন, পুরুষকে হত্যা করলে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়, অনুরূপভাবে নারীকে হত্যা করলেও মৃত্যুদণ্ড হবে। আবার কোনো নারী যদি অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে তারও একই শাস্তি হবে।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيُوةٌ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের প্রতি নিহতদের কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে, ক্রীতদাস ক্রীতদাসের বদলে এবং নারী নারীর বদলে। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কাউকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়,

তবে যথাযথ বিধির অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে তার দেয়া আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ, এরপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। হে বুদ্ধিমানরা কেসাসের মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।" (সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত-১৭৮-১৭৯)

আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেন—

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“আল্লাহ যেই প্রাণকে সম্মানিত করেছেন, যথাযথ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না।” (সূরা আল-ইসরা: ৩৩)

নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি; বরং প্রত্যেক মানুষের জীবনকে সম্মানিত ও সুরক্ষিত ঘোষণা করা হয়েছে। নারী কিংবা পুরুষ—কাউকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করার অনুমতি নেই।

অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে সমতা:

ইসলামী আইনে শারীরিক ক্ষতি করার শাস্তি বিনা পার্থক্যে নারী ও পুরুষ উভয়ের একই প্রকার। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। অন্যান্য অপরাধের ব্যাপারেও কোনো পার্থক্য নেই। যেমন, উভয়ের চুরির শাস্তি একই রকম। পাক কালামে ঘোষিত হয়েছে—

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে, তাদের হাত কেটে দাও, এটা তাদের কৃতকর্মের বিনিময় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল মায়েদা: আয়াত-৩৮)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, হাত কাটার ব্যাপারে নারী-পুরুষের জন্য একই আইন। যে-ই চুরিতে লিপ্ত হবে সে-ই পুরুষ হোক নারী হোক শাস্তি পাবে। লিঙ্গভেদে কোনো পার্থক্য হবে না, কোনো কমবেশিও কারো হবে না।

রাসূল ﷺ বলেন—

“মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৪৭৫)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী বিচারব্যবস্থায় ব্যক্তি, বংশ, লিঙ্গ বা সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য নেই। এমনকি রাসূল ﷺ নিজ কন্যার ক্ষেত্রেও একই আইন প্রযোজ্য হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

ব্যভিচারের ব্যাপারেও শাস্তির কোনো পার্থক্য নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين.ِ

"ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী তাদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনের দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (সূরা আন নূর: আয়াত-২)

এখানেও লিঙ্গভেদে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অবিবাহিত ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর শরিয়তের বিধানানুযায়ী একই শাস্তি নির্ধারিত। একশ' বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষ নারী হলে 'রজম' অর্থাৎ, পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে।

সাক্ষ্য প্রদান ও ন্যায়বিচারের অধিকার:

ইসলাম নারীকেও সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার দিয়েছে। এ অধিকার আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেই দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا.

"যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর তারা চার জন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।" (সূরা আন নূর-৪)

একটি সাধারণ অপরাধে দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন, কিন্তু বড়ো ধরনের অপরাধে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। ইসলাম কোনো নারীর অপরাধের ব্যাপারে চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য জরুরি করেছে। বস্তুত সম্মানের দৃষ্টিতে নারীর সতীত্ব একটি বিরাট সম্পদ, সেদিকে ইঙ্গিত করাটা বড় অপরাধ বলে গণ্য করেছে।

এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামে নারীর কত সম্মান এবং তার সতীত্বের গুরুত্ব কত বেশি। ইসলাম নারীর ন্যায়বিচার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষায় সুস্পষ্ট আইনি কাঠামো প্রদান করেছে।

বিবাহ বিচ্ছেদ ও খুলা গ্রহণের অধিকার:

ইসলামী শরীআতে সাধারণত তালাক প্রদানের প্রাথমিক অধিকার স্বামীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে নির্যাতন, অসামঞ্জস্যপূর্ণ দাম্পত্য জীবন, স্বামীর অক্ষমতা বা দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লে ইসলাম স্ত্রীকেও বৈধ পদ্ধতিতে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় কুর'আন কোন কিছুর বিনিময়ে স্ত্রীকে খুলা এর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

"এ তালাক দু'বার পর্যন্ত, তারপর হয় বিধিমত স্ত্রীকে রাখবে, না হয় সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়; কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী উভয় যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তারপর তোমরা যদি ভয় কর যে, তারা উভয় আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে নিস্কৃতি পেতে চায়, তাতে তাদের কারও কোন পাপ নেই। এ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। সুতরাং তা লঙ্ঘন কর না। যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করবে তারাই জালিম।"(সূরা আল বাক্বারাহ- ২২৯)

খুলা পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলাম নারীকেও বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে সম্মানজনকভাবে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে, যা নারীর আইনি সুরক্ষা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ দিক।

জাহেলী যুগে নারী নির্যাতনের একটি অপকৌশল এ যে, স্বামী কোন কারণে তার স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হলে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে তালাক দিত। আবার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তাকে ফিরিয়ে আনত। ফিরিয়ে আনার পরই পুনরায় তালাক দিত। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার ফিরিয়ে আনত। আবার তালাক দিত এবং আবার ফিরিয়ে

আনত। এমনি করে সারা জীবন ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে স্ত্রীকে কষ্ট দিত। নিজেও তাকে দাম্পত্য অধিকার হতে বঞ্চিত রাখত। আবার তালাক দিয়ে তাকে অন্য স্বামী গ্রহণের সুযোগও দিত না। আল-কুর'আন এ অমানবিক অত্যাচার হতে নারীকে মুক্তি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم. ٌ

"আর যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্তির কাছাকাছি হয়, তখন তোমরা তাদের হয় বিধিমত রেখে দেবে অথবা যথাবিধি মুক্ত করে দেবে; কিন্তু জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখ না। আর যে এরূপ করে সে তো নিজের প্রতি জুলুম করে। আল্লাহর নির্দেশাবলীকে তোমরা হাসি-তামাশার বস্তু কর না।" (সূরা আল বাক্বারাহ-২৩১)

দাম্পত্য বিরোধ নিরসনে শালিস নিয়োগ:

যখন স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন ইসলাম উভয় পরিবারের পক্ষ থেকে শালিস নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে ন্যায়সঙ্গত সমাধান ও পুনর্মিলনের পথ সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন—

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

"তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশংকা করলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"(সূরা আন নিসা-৩৫)

২.২.৫ অর্থনৈতিক অধিকার

উত্তরাধিকার:

ইসলাম নারীকে তার নিকটাত্মীয়ের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী অংশীদারিত্বও দান করেছে। অথচ পৃথিবীর অন্য সব জাতি নারীর এই অধিকারকে অস্বীকার করে, ফলে তারা কোনো মৃত নিকটাত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। নারীসমাজকে এই বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচিয়ে তার উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়ে আল্লাহ কুরআনের এই আয়াত নাযিল করেন-

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশি, এ অংশ নির্ধারিত।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭)

কুরআনের এই আদেশ মোতাবেক নারীরাও তাদের মাতা-পিতা, ভাই, ছেলে, স্বামী এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ছেড়ে যাওয়া ধন-সম্পদের অংশ পেতে শুরু করে।

কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের

উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়''। (সূরা আন নিসা ৪:১১)

অর্থাৎ, কোন নারীর যদি ভাই থাকে তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন কন্যা বাকি দুই ভাগ পাবেন পুরুষ। যদি কন্যা একাধিক হয় তাহলে পুরুষ পাবে অর্ধেক বাকি অর্ধেক কন্যাদের মধ্যে ভাগ হবে। আর যদি কোন ভাই না থাকে কন্যা একা হয় তাহলে কন্যা পাবে পিতা-মাতার রেখে যাওয়া অর্ধেক সম্পত্তি এবং কন্যা একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

স্বামীর পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে নারীর অধিকার :

স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও রয়েছে নারীর অধিকার। খ্রিষ্টান ধর্মে পিতার মৃত্যুর পর যদি তার কোনো পুত্র সন্তান জীবিত থাকে তবে কন্যা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে কিছুই পাবে না। এ বিষয়টি প্রচলিত বাইবেলে উল্লেখ আছে। পুত্র সন্তান দু'জন হলে বড় পুত্র পাবে ছোটজনের দিগুণ। পুত্র না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি কন্যার। কন্যা না থাকলে (মৃতের) ভায়ের। ভাই না থাকলে নিকটাত্মীয়র। তবুও মৃত ব্যক্তির বিধাবা স্ত্রী কিছুই পাবে না। অথচ ইসলাম স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার খুব মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যদি কারো স্বামীর ইন্তিকাল হয় আর সে স্বামীর কোনো সন্তান না থাকে তাহলে স্বামীর সমূদয় সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবেন। আর যদি স্বামীর সন্তান থাকে তাহলে স্ত্রী পাবেন এক-অষ্টমাংশ (আট ভাগের এক ভাগ)।

আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰي بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۗ

"আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে অসিয়ত করে গেছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান

থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছ তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি মা বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নাই এমন কোন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের একভাগ। আর যদি তারা এর থেকে অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়তস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল"। (সূরা আন নিসা ৪:১২)

মা জীবিত থাকতে যদি সন্তান মারা যায় তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে মায়ের অংশ থাকে। মা সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পান যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে। সন্তান না থাকলে এবং মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনও না থাকলে, মা এক-তৃতীয়াংশ পান।

এভাবেই ইসলাম সম্পত্তিতে ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

দেনমোহর:

ইসলাম-পূর্বযুগে নারীদেরকে তাদের বিয়ের দেনমোহর থেকেও বঞ্চিত করে রাখা হতো। বাপ, ভাই, স্বামী বা অন্য কোনো পুরুষ তার দেনমোহরের প্রাপ্য হজম করে যেতো। তার যৌতুক এবং উপহারগুলো সরাসরি স্বামীর দখলে চলে যেতো। ইসলাম নারীর ওপর পরিচালিত এই অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটায় এবং তাকে তার ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

বিবাহের সময় নারী তার স্বামীর কাছ থেকে 'মোহর' পাওয়ার অধিকারী, যা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব সম্পদ। এটি কোনো উপহার নয়, বরং নারীর আইনগত অধিকার। মেয়েদের বিয়ের দেনমোহর সম্পর্কেও কুরআন স্পষ্ট বলেছে-

وأتُوا النِّسَاءَ صَدُ قُتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

"আর নারীদের মোহর (প্রদেয় অর্থ) সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান কর, যদি সে সন্তুষ্ট চিত্তে মোহরের কিছু অংশ তোমাদের ক্ষমা করে দেয়, সেটা তোমরা আনন্দচিত্তে ভোগ করতে পার।" -(সূরা আন নিসা: আয়াত-৪)

এ আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, মোহরের মালিক একমাত্র স্ত্রী। তবে স্ত্রী যদি নিজের ইচ্ছায় মোহরের কোনো অংশ স্বামীকে প্রদান করে, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ। কিন্তু জোরপূর্বক বা চাপ প্রয়োগ করে মোহর গ্রহণ করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

"আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের কাউকে প্রচুর সম্পদও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না।" (সূরা আন-নিসা : ২০)

এ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, স্বামী স্ত্রীকে বিপুল পরিমাণ মোহর দিলেও তালাক বা বিচ্ছেদের সময় তা ফেরত নিতে পারবে না। এর মাধ্যমে ইসলামে নারীর আর্থিক অধিকার কতটা সুরক্ষিত তা প্রতীয়মান হয়।

মোহর আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন,

"যে ব্যক্তি কোনো নারীকে মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করল, অথচ তার নিয়ত হলো মোহর আদায় করবে না, সে ব্যভিচারীর ন্যায়।" — সুনান ইবনে মাজাহ ; হাদিস নং: ২৪১০

মোহর ইসলামে বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, কিন্তু বর্তমানে সমাজে এটি প্রায় গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। বিয়েতে লক্ষ টাকা ব্যয় হলেও মোহর নির্ধারণ করা হয় খুবই কম। যদিও ইসলামে মোহরের নির্দিষ্ট সীমা নেই, তবুও তা উভয়ের সামর্থ্য অনুযায়ী হওয়া উচিত।

অন্যদিকে, আমাদের সমাজে কম মোহর নির্ধারণ করে কনের পক্ষ থেকে টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি বা ফ্ল্যাটের মতো উপঢৌকন আশা করা হয়, যা ইসলামে সমর্থিত নয়। স্বেচ্ছায় কিছু দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ জন্য চাপ সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

নিজস্ব উপার্জনের ও অধিকার:

ইসলামে নারীর অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন নেই। স্থাবর-অস্থাবর সবরকমের সম্পদের ওপর নারীর পূর্ণ স্বাধীন অধিকার রয়েছে। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনসম্পদ আয় উপার্জন করার পূর্ণ স্বাধীনতাও নারীর আছে। সে সম্পদ থেকে নিজ পরিবারের ব্যয় করার কোনো শর্তারোপ করা হয়নি। সে নিজের উপার্জন নিজ খুশি অনুযায়ী ব্যয় করতে পারে। একজন নারী ব্যবসা, চাকরি বা অন্য কোনো বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করলে সেই অর্থের ওপর অন্য কারো (পিতা বা স্বামী) অধিকার নেই।

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

"পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩২)

অতএব, ইসলামে একজন নারী যদি পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে চায়, তাহলে এ ব্যাপারে ইসলামে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, যদি এতে ঘরের বাহিরে যেতে চায় তাও যেতে পারবে, তবে অবশ্যই তা ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক হতে হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে খাদিজা (রা.) তিনি একজন ব্যবসায়ী নারী ছিলেন। তিনি ঘরে বসেই একজন বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে তার যাবতীয় ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তার ব্যবসা তাকে ঘরের বাইরে যেতে বাধ্য করে নি এবং তার ঘরে কোন শূন্যতাও বিরাজ করেনি। বরং , তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তম সহযোগী ছিলেন আল্লাহর দ্বীনের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে এবং দীনি দায়িত্ব আঞ্জাম ও পরিচালনার জন্য তার ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

ভরণপোষণ:

নারীর নিজস্ব সম্পদ থাকলেও তার যাবতীয় ব্যক্তিগত খরচ (খাবার, পোশাক, বাসস্থান) বহন করার দায়িত্ব পুরুষের (পিতা, ভাই বা স্বামীর)। একজন নারীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা বা দায়-দায়িত্ব নেই। অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পরিবারের পুরুষের ওপর ন্যস্ত। বাস্তব ক্ষেত্রে যেখানে অর্থনৈতিক সংকট আছে, সেখানে তার কাজ করার সুযোগ আছে। এখানেও তাকে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, তিনি তার নিজস্ব সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَي النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰي بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

অর্থ: পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। (সূরা আন নিসা ৪:৩৪)

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম পুরুষকে নারীদের জন্য আর্থিক উপার্জন ও ব্যয়ের দায়-দায়িত্ব দিয়েছে। আর পুরুষকে এ দায়িত্ব সর্বাবস্থায় পালন করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"তোমাদের ওপর তাদের (স্ত্রীদের) অধিকার হলো তোমরা বিধিসম্মতভাবে তাদের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান করবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১২১৮)

দান-সদকা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার:

নারী তার সম্পদ নিজের ইচ্ছামতো খরচ বা দান করতে পারেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত জয়নব (রা.) কুটির শিল্পে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি চামড়া পাকা করার কাজে দক্ষ ছিলেন। এ কাজে যে অর্থ উপার্জিত হত, তা তিনি আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। (সহীহ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ

"হে নারী সমাজ! তোমরা সদকা করো (দান করো)।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই নির্দেশটি প্রমাণ করে যে, নারীদের হাতে নিজস্ব অর্থ থাকার এবং তা ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার ইসলাম দিয়েছে।

এছাড়া আল্লাহ কুরআনে বলেন,

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

"নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম করয দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান"। (সূরা আল-হাদীদ ৫৭:১৮)

২.২.৬ বৈবাহিক অধিকার:

স্বামী নির্বাচন এবং বিয়ের ক্ষেত্রে মতামতের অধিকার:

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পছন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ

"হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না" (সূরা আল বাক্বারাহ-২৩২)।

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী, কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে তার অমতে বিয়ে দেওয়া জায়েজ নেই। বিয়ের বৈধতার জন্য নারীর স্পষ্ট সম্মতি বা অনুমতি থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

কুরআনে নারীর স্বতন্ত্র সত্তা ও তার ইচ্ছার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হবে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯)

জাহেলি যুগে নারীদের পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া হতো। এই আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ তাআলা নারীদের ওপর পুরুষদের এই জবরদস্তি চিরতরে নিষিদ্ধ করেছেন। বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে কুমারী এবং বিধবা উভয়ের সম্মতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কোনো বিধবা বা বিবাহিতা নারীকে তার পরামর্শ (ও সম্মতি) ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কোনো কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।" সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! কুমারী মেয়ের অনুমতি কেমন করে বুঝব (যেহেতু তারা লজ্জায় চুপ থাকে)?' তিনি বললেন, "তার চুপ থাকাই তার অনুমতি (যদি সে দ্বিমত না করে)।" — সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫১৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪১৯

যদি কোনো পিতা বা অভিভাবক জোর করে মেয়ের অমতে বিয়ে দিয়েও দেন, ইসলাম সেই নারীকে আদালতে গিয়ে ওই বিয়ে ভেঙে দেওয়ার আইনি অধিকার দিয়েছে।

খানসা বিনতে খিযাম আল-আনসারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন বিবাহিতা (বিধবা) ছিলেন, তখন তাঁর পিতা তাঁর অমতে তাঁকে এক জায়গায় বিয়ে দেন। এই বিয়ে তাঁর পছন্দ ছিল না। তাই তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তখন তাঁর পিতার দেওয়া সেই বিয়েকে বাতিল (নাকচ) করে দিলেন। — সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫১৩৮

রাসুল (সা.) কুমারী মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই ফয়সালা দিয়েছেন:

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একটি কুমারী মেয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল যে, তার পিতা তার অমতে তাকে বিয়ে দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তখন তাকে اختيار (পূর্ণ স্বাধীনতা) দিলেন—সে চাইলে এই বিয়ে বহাল রাখতে পারে অথবা ভেঙে দিতে পারে। — সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২০৯৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৪৬৯

এসকল হাদিস প্রমাণ করে যে, অভিভাবক কেবল একজন প্রস্তাবক বা সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নারীর। যদি কোনো

নারীকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়, তবে ইসলামি আইনে সেই বিয়ে বাতিল করার অধিকার নারীর রয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার:

ইসলামে বিবাহ কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম নয়; বরং এটি পারস্পরিক ভালোবাসা, মানসিক প্রশান্তি, সহমর্মিতা ও দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পবিত্র বন্ধন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো "মাওয়াদ্দাহ" (গভীর ভালোবাসা) এবং "রহমাহ" (দয়া ও সহানুভূতি)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।" (সূরা আর-রূম : ২১)

এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম নারীর বৈবাহিক জীবনে মানসিক প্রশান্তি, ভালোবাসা, সম্মান ও নিরাপত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানে স্ত্রীকে কেবল গৃহপরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে নয়; বরং স্বামীর শান্তি, সান্ত্বনা ও জীবনের পরিপূর্ণতার মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে স্বামীকেও স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

"لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا" অংশ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানসিক প্রশান্তি ও আবেগিক নিরাপত্তা অর্জন। ফলে স্ত্রীর অধিকার হলো—সে স্বামীর নিকট থেকে ভালোবাসা, সম্মান, কোমল আচরণ ও আন্তরিকতা লাভ করবে। অপরদিকে "مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً" শব্দদ্বয় দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে, যেখানে পারস্পরিক ভালোবাসার পাশাপাশি দয়া, ক্ষমাশীলতা ও সহযোগিতার শিক্ষাও নিহিত রয়েছে।

ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে একতরফা কর্তৃত্ব নয়; বরং পারস্পরিক দায়িত্ব, ভালোবাসা ও সহযোগিতার সম্পর্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ বলেন—

وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ

"নারীদের জন্যও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে।" (সূরা আল-বাকারাহ: ২২৮)

আল্লাহ আরও বলেন—

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“তারা তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ।” (সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৭)

এই আয়াত স্বামী-স্ত্রীর গভীর সম্পর্ক, নিরাপত্তা, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতীক। অর্থাৎ, পোশাক যেমন মানুষকে রক্ষা করে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং আচ্ছাদন দেয়, তেমনি স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদার মাধ্যম।

সুবিচার পাওয়া:

স্ত্রীদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা এসেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

"তোমরা কখনও ন্যায়বিচার করতে পারবে না স্ত্রীদের মধ্যে যদিও তোমরা তা করতে চাও। তবে তোমরা সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড় না যাতে একজনকে ফেলে রাখ ঝুলন্ত অবস্থায়। যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর এবং মোত্তাকী হও তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"(সূরা আন নিসা-১২৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মানবীয় আবেগ ও অন্তরের ভালোবাসার পূর্ণ সমতা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও আচরণ, সময় প্রদান, ভরণ-পোষণ ও অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ একজন স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ে অন্যজনকে অবহেলা করা, তার অধিকার নষ্ট করা বা তাকে অনিশ্চয়তা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ।

“كَالْمُعَلَّقَةِ” অর্থাৎ “ঝুলন্ত অবস্থায়” বলতে এমন অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে স্ত্রী না পূর্ণ স্ত্রীর মর্যাদা পায়, না মুক্ত জীবনের সুযোগ পায়। ইসলাম এ ধরনের অবিচারকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে এবং স্বামীকে দায়িত্বশীল ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا..

"আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করে নেও অন্য নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের মনঃপুত হয়-দুই, তিন কিংবা চারজন পর্যন্ত। কিন্তু যদি আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের স্বত্বাধীন ক্রীতদাসীকে। এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার সম্ভাবনা অধিক"। (সূরা আন নিসা-৩)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামে একাধিক বিবাহের অনুমতি শর্তহীন নয়; বরং এর মূল শর্ত হলো সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। যদি কোনো ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে সে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে তাকে একজন স্ত্রীতেই সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি সময় বণ্টন, ব্যয়ভার ও ব্যবহারিক আচরণে সমতা রক্ষা করতেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেন অনিচ্ছাকৃত বিষয়ে তাকে পাকড়াও না করা হয়।

স্ত্রীকে উপ-পত্নী হিসেবে গ্রহণ না করা:

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে স্ত্রীদেরকে একমাত্র বিবাহের জন্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

"তোমাদের জন্য হালাল সতী-সাধ্বী মু'মিন নারী এবং আহলে কিতাবের সতী-সাধ্বী নারী, যখন তোমরা তাদের মহর প্রদান কর স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার কিংবা উপ-পত্নীরূপে গ্রহণের জন্য নয়"। (সূরা আল মায়েদা-৫)

উপরিউক্ত আয়াতের বর্ণনা হতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে স্ত্রীদেরকে একমাত্র বিবাহের জন্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন ব্যভিচারের বা উপ-পত্নী গ্রহণের জন্য নয়।

তালাক প্রাপ্তা নারীর পুণরায় বিয়ের অধিকার:

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য পারিবারিক জীবন যখন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে তখন ইসলাম তালাক বৈধ ঘোষণা করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে নিয়ম হল তালাক প্রাপ্তির পর তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়াই আল্লাহর বিধান এবং ইদ্দত পালনকালে স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে অবস্থান করলে স্বামীর ওপর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। আর যদি এ সময়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সংশোধন হয়ে যায় এবং স্বামী যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায় তাহলে নিতে পারবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم. ٌ

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে। তাদের পক্ষে বৈধ নয় গোপন রাখা যা আল্লাহ্ তাদের জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন, যদি তারা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হয়। আর যদি তারা আপোস-মীমাংসা করতে চায় তবে ঐ সময়ে তাদের ফিরিয়ে নিতে তাদের স্বামীরা অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের আছে তাদের ওপর। আর নারীদের ওপর রয়েছে পুরুষদের মর্যাদা। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। "(সূরা আন নিসা-২২৮)

বিধবা নারীর অধিকার:

ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মে স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রী মর্যাদাহীন হয়ে পড়ত। হিন্দুধর্মে স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীকেও আত্মহুতি দিতে হত। দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে ছিল না কোন স্বাধীনতা। কুর'আনে বিধবা নারীকে বিবাহ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে। বিধবা নারীরা অবহেলার পাত্র নয়, সমাজে তাদেরও মর্যাদা রয়েছে, তারা ইচ্ছা করলে পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيم.

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাদের স্ত্রীরা চারমাস দশদিন প্রতীক্ষা করবে। তারপর যখন তারা তাদের 'ইদ্দতকাল পূর্ণ করে নেবে, তখন বিধিমত তারা নিজেদের ব্যাপারে যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আর যদি তোমরা সে নারীর কাছে ইঙ্গিতে বিবাহের পয়গাম পাঠাও কিংবা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ জানেন যে, অবশ্যই সে নারীদের কথা তোমরা বলবে। কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া তাদের সাথে বিবাহ করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখ না এবং নির্ধারিত 'ইদ্দতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের কাজ সম্পন্ন করার দৃঢ় সংকল্প কর না। আর জেনে রেখ যে, তোমাদের মনে যা আছে, আল্লাহ্ তা জানেন, সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় কর। আরও জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল। "(সূরা আল বাকারাহ- ২৩৪,২৩৫)

২.২.৭ রাজনৈতিক অধিকার:

ভোটাধিকার:

ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন—

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم.

“হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন আপনার কাছে এসে বায়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, তার সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না (সন্তানকে, স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না) এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের বায়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।” (সূরা আল মুমতাহিনা: আয়াত-১২)

এখানে বাই'আতের কথা বলা হয়েছে। বাই'আতের অর্থ- আনুগত্য স্বীকার করা। সেদিনের রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য বর্তমান নির্বাচনের সমপর্যায়। কেননা, এ বাই'আতের মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ)-কে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নেয়ার এবং তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবেই ইসলাম সে যুগেই নারীদের ভোটাধিকার দান করেছে। নির্বাচনে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার পেয়েছিল।

আইন প্রণয়নে মতামত প্রদানের অধিকার:

একইভাবে ইসলাম নারীদের আইন প্রণয়নেও সক্রিয় অংশ নেয়ার অধিকার দিয়েছে। এক প্রসিদ্ধ বর্ণনায় আছে একবার হযরত ওমর (রাঃ) সাহাবা ও সাহাবীয়াদের নিয়ে মোহরের গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল মোহরের একটা সীমা নির্ধারণ করে দেবেন। কেননা, যুবকদের বিবাহ করা দিন দিন কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল। পেছন থেকে এক বৃদ্ধা উঠে কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াত পাঠ করলেন—

وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَّاتَيْتُمْ إِحْدُهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

"যদি তোমরা একজন স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী আনার সিদ্ধান্ত নিয়েই নাও, আর তাদের একজনকে প্রচুর সম্পদও দিয়ে থাকো, তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না।" (সূরা আন নিসা : আয়াত-২০)

বৃদ্ধা আরও বললেন, যখন কুরআন এরূপ অনুমতি দিয়েছে, মোহরে প্রচুর সম্পদ দেয়া যাবে, তাহলে তিনি কীভাবে মোহরকে নির্ধারিত সীমায় সীমাবদ্ধ করবেন? একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) সাথে সাথে নিজের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়ে বললেন, ওমর ভুল করেছিল, ওই বৃদ্ধাই ঠিক বলেছেন।

এ হাদিসের ঘটনায় ঐ নারী একজন সাধারণ নারী ছিলেন। অথচ তাঁর অধিকার ছিল আইন প্রণয়নের ব্যাপারে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার। সুতরাং, এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় একজন সাধারণ নারীরও মতামত প্রকাশ ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের সমালোচনা করার অধিকার স্বীকৃত ছিল।

শূরা ও পরামর্শমূলক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালামা (রাঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণের ঘটনা ইসলামে নারীর প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে মতামতের গুরুত্বের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৬ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে নিয়ে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা হন। কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের মধ্যে "হুদাইবিয়ার সন্ধি" সম্পাদিত হয়। সন্ধির কিছু শর্ত আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য কঠিন ও অসম্মানজনক মনে হওয়ায় অনেক সাহাবি মানসিকভাবে অত্যন্ত কষ্ট পান।

সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা কুরবানির পশু যবাই করে ইহরাম খুলে ফেলেন। কিন্তু গভীর দুঃখ ও হতাশার কারণে সাহাবিরা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করতে পারছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হয়ে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন।

তখন উম্মে সালামা (রাঃ) অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে বললেন—

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বাইরে গিয়ে কারো সঙ্গে কথা না বলে নিজেই আপনার কুরবানির পশু যবাই করুন এবং নাপিত ডেকে মাথা মুড়িয়ে ফেলুন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন। তিনি নিজে প্রথমে কুরবানি করলেন এবং মাথা মুড়িয়ে ফেললেন। তখন সাহাবায়ে কেরামও দ্রুত তাঁর অনুসরণ করে কুরবানি সম্পন্ন করেন ও ইহরাম থেকে বের হয়ে আসেন। এভাবে একটি জটিল ও আবেগপূর্ণ পরিস্থিতির সমাধান হয় উম্মে সালামা (রাঃ)-এর দূরদর্শী পরামর্শের মাধ্যমে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শুরূত, হাদিস নং ২৭৩১)

২.৩ নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামে পর্দা ও হিজাবের ভূমিকা

ইসলাম নারীকে সমাজের সম্মানিত ও মর্যাদাবান সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীর সম্ভ্রম, নিরাপত্তা, আত্মমর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য ইসলাম যে গুরুত্বপূর্ণ বিধান প্রদান করেছে, তার অন্যতম হলো পর্দা ও হিজাব। হিজাবের মাধ্যমে ইসলাম নারীকে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতাকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়। পশ্চিমা সমাজ যেখানে নারীর শারীরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত পছন্দকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, সেখানে ইসলাম নারীর পূর্ণ মর্যাদা এবং সামাজিক নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেয়।

২.৩.১ নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রম সংরক্ষণ

হিজাব নারীর ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যাতে সে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রদর্শনীর পরিবর্তে তার চরিত্র, জ্ঞান, আচরণ ও ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মূল্যায়িত হয়। এর ফলে নারী সমাজে সম্মানজনক পরিচয় লাভ করে এবং তার সম্ভ্রম সংরক্ষিত থাকে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে সহজেই চেনা যাবে এবং তারা উত্ত্যক্ত হবে না।" — সূরা আল-আহযাব: ৫৯
এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পর্দার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, হিজাব নারীকে মর্যাদাপূর্ণ পরিচয়ে উপস্থাপন করে এবং তাকে অসম্মান, কুদৃষ্টি ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে সুরক্ষিত রাখে। মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন, " فَلَا يُؤْذَيْنَ" অর্থাৎ "তারা যেন কষ্টপ্রাপ্ত না হয়"—এই অংশটি নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার দিকটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—
"নারী হলো আচ্ছাদনের বস্তু। যখন সে ঘর থেকে বের হয়, শয়তান তাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।" — সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১১৭৩
এ হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায়, ইসলাম নারীকে অপমান বা অবমূল্যায়নের জন্য নয়; বরং তাকে অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি ও ফিতনা থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য শালীনতার নির্দেশ দিয়েছে।

২.৩.২ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

ইসলাম সমাজে পবিত্রতা, শালীনতা ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখতে নারী-পুরুষ উভয়কেই চরিত্র সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে। এজন্য সর্বপ্রথম পুরুষদের দৃষ্টি সংযত করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।” — সূরা আন-নূর: ৩০

এরপর আল্লাহ তাআলা নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন—

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“আর মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের ওড়না বক্ষদেশের উপর টেনে দেয়।” — সূরা আন-নূর: ৩১

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায়, ইসলাম কেবল নারীদের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি; বরং নারী-পুরুষ উভয়কেই শালীনতা, দৃষ্টি সংযম ও চরিত্র রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। পর্দা নারীর চলাফেরায় সংযম ও নিরাপত্তা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে সমাজে অশালীনতা, কুদৃষ্টি ও নৈতিক অবক্ষয়ের পথ রুদ্ধ হয়।

২.৩.৩ আত্মমর্যাদা ও শালীনতা রক্ষা

ইসলামে শালীনতা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হিজাব নারীর মধ্যে লজ্জাশীলতা, সংযম ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে। এটি নারীর ব্যক্তিত্বকে মার্জিত করে এবং তাকে শালীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

“লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।” — সহীহ বুখারী, হাদীস: ৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৩৫

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

“প্রত্যেক ধর্মের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জাশীলতা।” — সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৪১৮১

ইসলামে পোশাকের উদ্দেশ্য কেবল দেহ আবৃত করা নয়; বরং এমনভাবে আবৃত করা, যাতে শরীরের সৌন্দর্য ও গঠন প্রকাশ না পায়। এ কারণেই ইসলাম আঁটসাঁট, স্বচ্ছ ও দৃষ্টি আকর্ষণকারী পোশাক পরিধানকে উৎসাহিত করেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“জাহান্নামবাসী দু’ প্রকার মানুষ, আমি যাদের (এ পর্যন্ত) দেখিনি। একদল মানুষ, যাদের সঙ্গে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তা দ্বারা তারা লোকজনকে মারবে এবং এক দল স্ত্রী লোক, যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জান্নাতে যেতে পারবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না অথচ এত এত দূর হতে তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।” — সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২১২৮

এ হাদীসে “পোশাক পরিহিত উলঙ্গ” বলতে এমন পোশাককে বোঝানো হয়েছে, যা আঁটসাঁট, পাতলা এবং শরীরের গঠন ও আকৃতি প্রকাশ করে। উলামায়ে কেরামের মতে, এখানে এমন নারীদের বোঝানো হয়েছে, যারা পোশাক পরিধান করলেও তা শরীরকে যথাযথভাবে আবৃত করে না।

২.৩.৪ সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানজনক উপস্থিতি

ইসলাম নারীকে গৃহবন্দি করার শিক্ষা দেয়নি; বরং তাকে শালীনতা ও মর্যাদা বজায় রেখে সমাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, বহু সাহাবী নারী জ্ঞানচর্চা, হাদীস বর্ণনা, চিকিৎসাসেবা এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও হাদীস বিশারদ। বহু সাহাবী ও তাবেঈ তার নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এছাড়া মহিলা সাহাবীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা করেছেন এবং দ্বীনের বিভিন্ন খেদমতে অংশগ্রহণ করেছেন।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম নারীর প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশে বাধা দেয়নি; বরং পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে তাকে সমাজে সম্মানজনকভাবে অবদান রাখার সুযোগ দিয়েছে।

২.৩.৫ সাহাবী নারীদের জীবনে পর্দার বাস্তব প্রয়োগ

ইসলামে হিজাবের বিধান নাজিল হওয়ার পর সর্বপ্রথম তা বাস্তবায়ন করেছিলেন মহিলা সাহাবীগণ। তারা এই বিধানকে বোঝা মনে করেননি; বরং আল্লাহর আদেশ হিসেবে

আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছিলেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তা বাস্তবায়ন করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন—

“আল্লাহ আনসার নারীদের প্রতি রহম করুন। যখন ‘তারা যেন তাদের ওড়না বক্ষদেশে টেনে দেয়’—এই আয়াত নাজিল হলো, তখন তারা নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে মাথা ও শরীর ঢেকে ফেললেন।” — সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪৭৫৮

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, সাহাবী নারীরা পর্দাকে কেবল সামাজিক রীতি হিসেবে নয়; বরং আল্লাহর নির্দেশ ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাদের জীবনে হিজাব ছিল ঈমান, শালীনতা ও আত্মসম্মানের বহিঃপ্রকাশ।

এছাড়া হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

“যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার কাপড় ঝুলিয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।”

এ কথা শুনে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন—

“তাহলে নারীরা তাদের কাপড় কীভাবে রাখবে?”

তিনি বললেন, “এক বিঘত ঝুলিয়ে দেবে।”

তিনি বললেন, “তাহলে তো তাদের পা প্রকাশ হয়ে যাবে।”

তিনি বললেন, “তবে এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে দেবে, এর বেশি নয়।”

— সুনানে তিরমিযী, হাদীস: **১৭৩১**

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, সাহাবী নারীরা নিজেদের শরীরের সামান্য অংশ প্রকাশ পাওয়াকেও অপছন্দ করতেন, যা নারীর শালীনতা ও পর্দার প্রতি ইসলামের গুরুত্বকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

সুতরাং, ইসলামে পর্দা ও হিজাব নারীর প্রতি কোনো অবিচার বা স্বাধীনতা হরণের মাধ্যম নয়; বরং এটি তার অধিকার, মর্যাদা, সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ইসলাম নারীকে এমন এক সম্মানজনক জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছে, যেখানে সে আল্লাহর বিধান মেনে শালীনতা, আত্মমর্যাদা ও পবিত্রতা বজায় রেখে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। এটাই ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ও পবিত্র জীবনব্যবস্থা।

অধ্যায়:৩: নারীবাদ: প্রেক্ষাপট ও বিবর্তন

৩.১ নারীবাদের ধারণা ও এর প্রেক্ষাপট

৩.১.১ নারীবাদের ধারণা:

নারীবাদ বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত একটি আন্দোলন যা নারীর ক্ষমতায়ন, ভোটদানের অধিকার এবং নারী পুরুষ সমান এই দাবী থেকে শুরু হয়।

নারীবাদ ১৮৮০ সালে বৈশ্বিক আন্দোলন হিসেবে ফ্রান্সে, ১৮৯০ সালে যুক্তরাজ্যে এবং ১৯১০ সালে যুক্তরাষ্টে নারীবাদ শব্দটির প্রচলন হয়। নারীবাদ হলো নারী ও পুরুষের মধ্যকার সমতার একটি মতবাদ, যাতে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বিস্তার রোধে নারীদের সংগঠিত হওয়ার উপর এবং সামাজিক জীব হিসেবে সমঅধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের জন্য সমাজকে নিরাপদ আবাসস্থলে রূপান্তরিত করার উপর গুরুত্ব দেয়।

৩.১.২ নারীবাদ মতাদর্শ:

নারীবাদ মতাদর্শ হলো নারীরা রাজনৈতিক, সামাজিক, লৈঙ্গিক, বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে। নারীবাদের কর্মকান্ড বৃহৎ পরিসরে নারীদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত। নারী যেখানে বৈষম্যের শিকার, পুরুষের অধস্তন, সেখানে নারীবাদ এ অবস্থার পরিবর্তন সাধনে পরিচালিত। নারী আন্দোলনকারীরা নারীর আইনগত অধিকার (চুক্তির অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, বৈবাহিক অধিকার, ভোটাধিকার), দৈহিক স্বাধীনতা ও অখন্ডতা রক্ষার অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, প্রজনন অধিকার (যথেচ্ছা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করার অধিকার, সন্তানের সংখ্যা নির্ধারণের অধিকার, উন্নতমানের প্রসূতি চিকিৎসা লাভের অধিকার) অর্জনের জন্য, পারিবারিক সহিংসতা, শারীরিক ও মানসিক হয়রানি ও নিগ্রহ থেকে নারী ও কিশোরীর নিরাপত্তার জন্য; সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য, বেসরকারি খাতে চাকরিক্ষেত্রে, ব্যবসা বানিজ্যে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য; কর্মস্থলে নারীর অধিকার, যার মধ্যে মাতৃত্ব ছুটি, সমান মজুরি ও বেতন

প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত; সকল মানবাধিকার লাভ করার সুযোগ নিশ্চিত করা, এবং শিক্ষার সকল স্তরে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্ব দেয়। বস্তুত যেখানে নারীর প্রতি বৈষম্য বিদ্যমান, নারী আন্দোলনকারীরা সেসব জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যের প্রতি গুরুত্ব দেয়।

৩.১.৩ নারীবাদী আন্দোলনের ধারা:

নারীবাদী আন্দোলন তিনটি ধারায় পরিচালিত হয়েছে।

প্রথম ধারা: নারীবাদের প্রথম ধারাটি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে সক্রিয় ছিল। এ পর্যায়ে বৈবাহিক চুক্তিতে সমঅধিকার এবং সম্পত্তি লাভ ও ভোগ করার অধিকার অর্জনের দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে প্রথম ধারা যাত্রা শুরু করে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ প্রধান দাবিতে পরিণত হয় এবং নারীবাদী আন্দোলন নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। ঐ আন্দোলনে যুক্তরাজ্যে গৃহসম্পত্তির মালিক ত্রিশোর্ধ মহিলারা **১৯১৮** সালে ভোটাধিকার অর্জন করে। **১৯২৮** সালে **২১** বছরের ঊর্ধ্বে সকল নারী ভোটাধিকার লাভ করে। ভোটাধিকার প্রাপ্তি প্রথম ধারার নারীবাদের উল্লেখযোগ্য অর্জন।

দ্বিতীয় ধারা: দ্বিতীয় ধারায় এসে নারীবাদী আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠা নারীবাদের লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় ধারার নারীবাদের মধ্যে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, সাংস্কৃতিক অসমতা ও রাজনৈতিক অসমতা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে তারা সকল নারীকে বোঝাতে সচেষ্ট হন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তার ক্ষমতার কাঠামোয় নারীর ব্যক্তিগত জীবনকে পুরুষের চাহিদা মতো গড়ে তুলেছে। এই অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় দ্বিতীয় ধারার নারীবাদী শ্লোগান 'যা ব্যক্তিগত তা-ই রাজনৈতিক'।

১৯৬৩ সালে বেটি ফ্রাইডেন তাঁর *The Feminine Mystique* গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে তৎকালীন কলেজ-শিক্ষিত নারীদের অসন্তোষ ও স্বপ্নভঙ্গকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেসব শিক্ষিত নারী আশানুরূপ চাকরি পাননি তাদের গৃহের কাজে (রান্না করা ও ঘরগোছানোর কাজ) বাধ্য করা হয়েছে। বেটি ফ্রাইডেন নারীর জীবনে পরিপূর্ণতা আসে 'সন্তান প্রতিপালনে এবং গৃহকর্ম সম্পাদনে', এ মতাদর্শের তীব্র সমালোচনা

করেন। তাঁর মতে নারী একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস ব্যবস্থার শিকার, যে ব্যবস্থা নারীকে স্বামী ও সন্তানের মাঝে নিজ জীবনের পরিচয় ও অর্থ খুঁজতে বাধ্য করে এবং নারীকে পরিবারের পরিচিতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজের পরিচিতি বিসর্জন দিতে বাধ্য করে। সমাজে নারীর ভূমিকার এই নতুন ব্যাখ্যা নারীমুক্তি আন্দোলনের পথ দেখায় এবং 'মুক্তি' নারীর আকাঙ্খার রূপায়ন হিসেবে পরিগণিত হয়।

'নারীমুক্তি' শ্লোগানটি প্রথম ব্যবহূত হয় ১৯৬৪ সালে। ১৯৬০ এর দশক থেকে নারীমুক্তি আন্দোলন সমতার দাবি তোলে। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল পুরুষের সমান পারিশ্রমিক, পুরুষের সঙ্গে সমান আইনগত অধিকার, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের স্বাধীনতা ইত্যাদি। নারীমুক্তি আদর্শের সঙ্গে যে সকল বিষয় জড়িত হয়, তার মধ্যে রয়েছে দেহের অখন্ডতা, স্বাধীনতা ও চলাফেরার অধিকার; সার্বজনীন ভোটাধিকার; সরকারি পদলাভের অধিকার; কাজ করার অধিকার: ন্যায্য ও সমান বেতনের অধিকার; সম্পত্তির মালিকানা; শিক্ষা; সামরিক বাহিনীতে কর্ম; আইনগত চুক্তি করার অধিকার; সর্বোপরি, বৈবাহিক, পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ও ধর্মীয় অধিকার। যদিও নারী মুক্তি প্রত্যয়টি জনমনে গৃহীত হয়েছে, তথাপি নারী আন্দোলন প্রত্যয়টি নারীমুক্তি প্রত্যয়ের সমার্থক হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন দেশে ব্যবহূত হয়। দ্বিতীয় ধারার নারীবাদের দুটি মূল শ্লোগান হলো 'যা ব্যক্তিগত তা-ই রাজনেতিক' এবং 'নারীমুক্তি'।

তৃতীয় ধারা: এটি শুরু হয় ১৯৯০-এর দশকে। দ্বিতীয় ধারার নারীবাদে শ্বেতাঙ্গ নারীদের প্রতিচ্ছবি রূপায়ন করাকে তৃতীয় ধারার নারীবাদ চ্যালেঞ্জ করেছে এবং ঐ ধারার মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ নারীর অভিজ্ঞতার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ এবং শ্বেতাঙ্গ মহিলার অভিজ্ঞতাকে বিশ্বজুড়ে সকল নারীর অভিজ্ঞতা হিসেবে গ্রহণ করার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করেছে। দ্বিতীয় ধারার মতবাদের বিরোধিতা এসেছে মূলত পূর্বের উপনিবেশ ও তৃতীয় বিশ্ব থেকে। তৃতীয় ধারার নারীবাদ বিশ্বাস করে যে, ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্য দেশগুলোর হাতে বর্ণগত, শ্রেণিগত ও নৃগোষ্ঠীগত শোষণ ঔপনিবেশিকউত্তর সমাজে নারীকে প্রান্তিক করে রেখেছিল। এ ধারা মতে, ঔপনিবেশিক সমাজে পিতৃতন্ত্রই জেন্ডার বৈষম্যর একমাত্র কারণ নয় বরং ঐ সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যের অন্যতম কারণ হলো উপনিবেশবাদ। ঔপনিবেশিকউত্তর নারীবাদীরা উপমহাদেশের শিক্ষিত নারীদের নিস্ক্রিয় ও নির্বাক প্রতিরূপ এবং পশ্চিমা আধুনিক শিক্ষিত এবং ক্ষমতাশীল নারীর চিত্রকে সমালোচনা করেন। তৃতীয় ধারার নারীবাদ মূলত স্থান ও সংস্কৃতি ভেদে নারীদের পরস্পর থেকে ভিন্ন বলে মনে করে।

তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদীরা 'আত্মপরতন্ত্র বর্ণবাদ, শ্রেণিবাদ, জাতিবিদ্বেষ' এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর নারীদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা উপেক্ষা করার জন্য পশ্চিমা নারীবাদীদের সমালোচনা করে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রেক্ষাপটে যে নারীবাদ বিকাশ লাভ করেছে, পশ্চিমা নারীবাদীরা সে নারীবাদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করায় সমালোচিত হয়েছে। শ্বেতাঙ্গ নারীবাদ অ-শ্বেতাঙ্গ বিশ্বের নারীদের সমস্যা বুঝতে পারে নি।
তৃতীয় ধারার নারীবাদের মূল যুক্তি হলো নারীরা বর্ণ, জাতি, দেশ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন। তৃতীয় ধারার নারীবাদ সকল স্ববিরোধিতা ও দ্বন্দ্বকে গ্রহণ করে এবং সকল বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনকে স্থান করে দেয় এবং নারীর জন্য কি মঙ্গলকর, কি মঙ্গলকর নয়, সে সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারার মডেলকে চ্যালেঞ্জ করে। উন্নত ও উন্নয়নশীল সমগ্র বিশ্বে স্কুল কলেজে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, তারা শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করছে, তারা শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করছে। তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে, পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে। চলাফেরার স্বাধীনতা কাজে লাগিয়ে তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে। তারা বিচিত্র অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে বিগত দশকের নারীবাদের মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করেছে। তারা সত্তর দশকের নারীবাদীদের বিশ্বাস ও কর্মকান্ডকে অনুসরণ করতে সম্মত নয়। নতুন অর্জিত স্বাধীনতা তাদের অতীতের অবস্থায় আবদ্ধ থাকতে সম্মত নয়। তারা অগ্রসর হতে চায় এবং স্বাধীন নারী প্রজন্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা নতুন ও অভিনব পরিপূর্ণতা লাভ করতে চায়। তৃতীয় ধারার নারীবাদের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে সহিংসতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তৃতীয় ধারা পারিবারিক সহিংসতা এবং কর্মস্থলে হয়রানির বিরোধিতা করে।

৩.১.৪ জাতিসংঘ-ব্যবস্থায় নারীবাদ:

নারীবাদী আন্দোলন জাতিসংঘ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘ নারীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহবান করেছে। মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭৫-১৯৮৪ পর্যন্ত জাতিসংঘ নারী উন্নয়নের দশক হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সম্মেলন ও দশকব্যাপী কর্মকান্ডের দরুন পরবর্তী সময়ে কোপেন হেগেন (১৯৮০) ও নাইরোবিতে (১৯৮৫)

অনুষ্ঠিত সম্মেলনে নারী উন্নয়নের বৃহৎ সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং নারীর লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়।

১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত সর্বশেষ বিশ্ব নারী সম্মেলনে প্লাটফর্ম অফ অ্যাকশন (পিএফএ) নামে কর্মপন্থা স্বাক্ষরিত হয়, যাতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 'জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন'-এর লক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলের নাম দেয়া হয় 'জেন্ডারকে মূলধারায় আনয়ন', যার অর্থ হলো সকল নারী ও পুরুষ 'পূর্ণ মানবাধিকার অর্জনের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং জাতীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগও লাভ করবে।' এরই প্রেক্ষাপটে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য বিলোপের সনদ (সিডও) গৃহীত হয় (১৯৭৯) এবং নারীর জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল আকারে ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাস হয়।

বৈশ্বিক পর্যায়ে গৃহীত উপরোক্ত নীতি ও কর্মকান্ড নারীবাদ ও নারীবাদী আন্দোলনকে জোরদার করেছে। মত পার্থক্য সত্ত্বেও সকল নারী ও নারী তাত্ত্বিকগণ একমত হন যে, নারী বৈষম্য, অসমতা, ও অন্যায়ের শিকার এবং এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম ও আন্দোলন তাদের ন্যায়সঙ্গত অভিযান, সত্য প্রতিষ্ঠার অভিযান।

২০০৪ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বেতনভূক্ত কর্ম এবং বেতনহীন গৃহকর্মে অংশগ্রহণ করলেও নারীরা গড়ে পুরুষের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর গ্রামাঞ্চলে নারীরা পুরুষের চেয়ে গড়ে ২০ শতাংশ বেশি কাজ করে। ২০০১ সালে জাতিসংঘের প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নারী সংগঠনগুলোর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তথ্য প্রদান করা হয় যে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ হলো নারী এবং মোট নারী-পুরুষ মিলিত শ্রমের ৬৬ শতাংশ শ্রম দান করে নারীরা। এতদসত্ত্বেও নারী পায় বিশ্বের মোট আয়ের মাত্র ১০ শতাংশ এবং বিশ্বের মোট সম্পদের মাত্র ০১ শতাংশের মালিক হয় নারী। নারীবাদ এ স্বচ্ছ অসমতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সকল বৈষম্য দূর করে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের জন্য কাজ করে।

৩.১.৫ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীবাদ:

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রথা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নারীরা পাশ্চাত্য নারীদের চেয়ে পরস্পর ভিন্ন এবং পাশ্চাত্য নারীর অবয়ব বাংলাদেশী নারীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং বাংলাদেশী নারীদের জন্য প্রযোজ্যও নয়। পাশ্চাত্যকে যদি নারীবাদের উৎপত্তিস্থল হিসেবে দাবি করা হয়; তবে বাংলাদেশে সহজাত নারীবাদের সৃষ্টি হয়েছে, যা পাশ্চাত্যের নারীবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মনে করতেন নারী সামাজিক জীব; নারীকে নিজের কথা নিজেকে সমস্বরে বলতে হবে, অন্য কেউ নারীর হয়ে বলবে না। রোকেয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না এবং পশ্চিমা নারীবাদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না; শ্বেতাঙ্গ নারীবাদীদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তার সুলতানার স্বপ্ন (১৯২৪) বইয়ে নারী পরিচালিত বৈচিত্র্যপূর্ণ, সমতাভিত্তিক কাল্পনিক নারীবিশ্বের চিত্র তুলে ধরেছেন, যা হবে শোষণ থেকে মুক্ত। অস্তিত্বের জন্য সুলতানার সংগ্রাম এবং নারীমুক্তির জন্য তার কাজ প্রভৃতি ছিল নারীবাদের উদাহরণ। রোকেয়া তার লেখনীর মধ্য দিয়ে সমাজের কুসংস্কার, অবরোধ প্রথার অতিরিক্ত প্রভাব, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, নারী শিক্ষা, নারীর প্রতি সামাজিক অবমাননা, নারীর অধিকার এবং নারী জাগরণের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছেন। নারী অধিকারের সর্বপ্রথম প্রবক্তা ছিলেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)। কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁকে 'বিশ্বের প্রথম নারীবাদীদের অন্যতম' আখ্যা দিয়েছেন। সপ্তম শতাব্দীতে তিনি আরবদেশের নারীকে বিবাহ, তালাক এবং উত্তরাধিকারের যে অধিকার প্রদান করেছিলেন, তাঁর সময়কালে বিশ্বের কোথাও নারীর এসব অধিকার ছিল না।

১৯৭৩ সালের শুরুর দিকে কতকসংখ্যক নারী বাংলাদেশের নারীদের সমস্যা, অসমতা ও বৈষম্য নিয়ে গবেষণা করার জন্য Women For Women: Research and Study Group নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নারীবিষয়ক প্রকাশনার পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে এবং বাংলাদেশের নারী সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ ও রচনা প্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানটি একটি তথ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছে যেখানে নারীবাদ বিষয়ক গ্রন্থ ও তথ্যাদি সংরক্ষিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশের নারীর বিশেষ সমস্যা তুলে ধরা এবং প্রচার-প্রচারণা চালানো।

নারীবাদী গবেষণায় প্রভাবিত হয়ে ইতোমধ্যে বেশ কিছু সংগঠন নারী আন্দোলন ত্বরান্বিত করেছে। ১৯৭০ সালের গোড়ার দিক থেকে মহিলা পরিষদ নারীর সমস্যা ও স্বার্থ নিয়ে কাজ করে চলেছে। অধিকন্তু ১৯৮০ সাল থেকে বেশ কিছু সংগঠন নারী উন্নয়নের কর্মকান্ডে যোগ দেয়। এদের মধ্যে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, মহিলা আইনজীবী সমিতি, নারীপক্ষ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নিজেরা করি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, আমরাও পারি, নারী প্রগতি সংঘ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব প্রতিষ্ঠান নারীর অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করে, অসমতা বিলোপের জন্য আন্দোলন করে এবং নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রতিহত করে।

৩.২ নারীবাদের বিভিন্ন মতবাদ:

উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism):

Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, Harriet Taylor Liberal Feminism এর প্রবক্তা। Betty Friedman মূলত রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর সমর্থক ছিলেন। বিদ্যমান সমাজ কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখে পুরুষের মত নারীরও সমান অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করাটা হলো এর মূল বৈশিষ্ট্য। এরা মূলত সংস্কারে বিশ্বাসী। তাদের আশা বিদ্যমান সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন বিধি ব্যবস্থা সংস্কার সংশোধন করে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য ও অসমতা দূর করা সম্ভব।

মার্কসীয় নারীবাদ (Marxist Feminism):

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস মার্কসবাদী মতাদর্শ হলো এ নারীবাদের ভিত্তি, লেনিন, অগাস্ট বেবেল, ক্লারা জেটকিন, আলেকজান্ডার কোলনতাই প্রমূখ এই মার্কসীয় নারীবাদের ভিত্তি নির্মান করেছে। এরা শ্রেণী বৈষম্যকে নারী নির্যাতনের কারণ বলে চিহ্নিত করেন। Capitalism উচ্ছেদ করে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নারী মুক্তি সম্ভব বলে এরা মনে করেন। এদের কাছে নারীমুক্তি আন্দোলন পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং পুরুষতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের বিরূদ্ধে।

আমূল নারীবাদ (Radical Feminism):

বিংশ শতাব্দীর ৬০-এর দশকে এই নারীবাদী ধারার উদ্ভব ঘটে পাশ্চাত্যে। Shula mittle Firestone এই ধারার জনক। Kate Millett, Marilyn French এ মতবাদের প্রবক্তা। এই নারীবাদের মূল কথা হলো, পুরুষ নারীকে শোষণ করে Sexual oppressionএর মাধ্যমে। এরা নারী ও পুরুষের বিচ্ছেদে বিশ্বাসী। পিতৃতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক অস্বীকার করে নারীর স্বাতন্ত্র্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিদার। এখানে পুরুষকে প্রতিপক্ষরুপে চিহ্নিত করে প্রচলিত বৈবাহিক সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়। তারা উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে মাতৃগর্ভের বাইরের সন্তান জন্মদানের পক্ষে যাতে করে রাষ্ট্র এবং পুরুষদেরও মানব প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার দায় সমানভাবে বহন করতে হয়। নারীকে যৌন সামগ্রী হিসেবে পুরুষ 'যৌন রাজনীতি' (Sexual politics) মাধ্যমে যে শোষণ চালায় তার আমূল বিলোপ সাধনই নারী মুক্তির মূলকথা। এরা (Homosexual) সমকামে বিশ্বাসী এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন লালন করে যা বর্তমান পরিবারের বিলুপ্তি ঘটাবে। তারা বিশ্বাস করে, পিতৃতন্ত্র ও তার অনুসারী সমাজ ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত করে নারী ও পুরুষের সমতা আনা সম্ভব। এই ধারাকে অনেকে উগ্র নারীবাদ (Ultra left feminism) বলে চিহ্নিত করে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist Feminism):

রেডিক্যাল এবং মার্কসীয় নারীবাদের এক ধরনের মিলিত রূপ হলো সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ। এরা মনে করে যে, ধনতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের জটিল মিথস্ক্রিয়া নারীর প্রতি বৈষম্যের কারণ এবং ধনতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র উভয়ের বিলোপ সাধন না করে নারী মুক্তি সম্ভব নয়। এরা বিশ্বাস করে যে, নারীর প্রকৃত স্বাধীনতাই সমাজের সমতা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। এই নারীবাদকে অনেকে Social Feminism রূপেও অভিহিত করে থাকে।

সাংস্কৃতিক নারীবাদ (Cultural Feminism):

কিছুটা Radical Feminism এবং কিছুটা Socialist Feminismএর মিলিতরূপ এই Cultural Feminism মনে করে যে, জেন্ডার সম্পর্ক স্যামজিক ও ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট এবং তা পরিবর্তনযোগ্য। নারী-পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যজনিত বাস্তবতা নয়, মনস্তাত্ত্বিক গড়নই নারীর অধিনস্ততার কারণ। এই নারীবাদ কখনো মাতৃত্বকে অবমুল্যায়ন এবং নারী সুলভ গুণাবলীকে ধ্বংস করার পক্ষপাতি নয়। অবশ্য এরাও পুরুষকে তাদের শত্রুরূপে বিবেচনা করে।

পরিবেশ নারীবাদ (Eco Feminism):

নারী ও প্রকৃতির উপর সমানন্তরালভাবে বিদ্যমান পুরুষ প্রাধান্যের অবসান দাবি করে এই নারীবাদ। ভারতের বন্দনা শিবা, মারিয়ামিজ প্রমূখ এই পরিবেশ নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা। পরিবেশ নারীবাদ নারী এবং পরিবেশকে অভিন্ন মাত্রায় সংযোজন করে। এর মল বক্তব্য হলো নারী ও প্রকৃতি উভই পিতৃতন্ত্রের নির্মম শিকার।

বৈশ্বিক নারীবাদ (Global Feminism):

এই ধারা নারীদের অবস্থানকে বৈশ্বিকভাবে দেখার একটি দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। তারা মনে করে লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ নির্মানের কর্মকৌশল এমন একটি বৈশিষ্ট্যকে সাপোর্ট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে যেখানে প্রতিটি সমাজের নারীরা তাদের সমস্যাবলীকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা ও সমাধানের উপায় খুঁজে বের করাই এ মতবাদের মূল বক্তব্য।

৩.৩ আধুনিক নারীবাদের মূল দাবি ও দর্শন

আধুনিক নারীবাদ মূলত নারী–পুরুষ সমতা, অধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এটি একক কোনো ধারণা নয়; বরং বিভিন্ন ধারা, মত ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি। নিচে আধুনিক নারীবাদের প্রধান দাবি গুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো—

১. সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার:

আধুনিক নারীবাদের মূল ভিত্তি হলো লিঙ্গীয় সমতা (Gender Equality)। এটি কেবল পুরুষ ও নারীর সমান অধিকারের কথা বলে না, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে নারীর প্রতি বিদ্যমান কাঠামোগত বৈষম্য বিলোপের দাবি জানায়।

২. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ:

আধুনিক নারীবাদ নারীর নিজের দেহের ওপর তার পূর্ণ অধিকার বা 'বডি অটোনমি'র ওপর গুরুত্বারোপ করে।

- **প্রজনন স্বাস্থ্য:** গর্ভপাত, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং নিজের শরীর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা।
- **নিরাপত্তা:** ধর্ষণ, যৌন হয়রানি এবং পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৩. ইন্টারসেকশনালিটি বা আন্তঃসংশ্লিষ্টতা:

কিম্বার্লি ক্রেনশ-র প্রবর্তিত এই ধারণা অনুযায়ী, নারীর শোষণ কেবল লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করে হয় না। বরং বর্ণ, শ্রেণি, ধর্ম, জাতিগত পরিচয় এবং শারীরিক সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে এক একজন নারীর শোষণের ধরণ ভিন্ন হতে পারে। আধুনিক নারীবাদ তাই সকল স্তরের (যেমন: কৃষ্ণাঙ্গ নারী, তৃতীয় বিশ্বের নারী, শ্রমিক নারী) অধিকার নিয়ে কথা বলে।

৪. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও কর্মক্ষেত্রে সমতা:

অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ছাড়া নারীর মুক্তি অসম্ভব—এই দর্শন আধুনিক নারীবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এর দাবিগুলো হলো:

- **সমান মজুরি:** একই কাজের জন্য নারী ও পুরুষের সমান বেতন (Equal pay for equal work) নিশ্চিত করা।
- **কাঁচের ছাদ (Glass Ceiling) ভাঙা:** করপোরেট বা রাজনৈতিক উচ্চপদে নারীর অংশগ্রহণে যে অদৃশ্য বাধা থাকে, তা দূর করা।
- **অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি:** নারী ঘরে যে শ্রম দেয়, তার অর্থনৈতিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।

৫. পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন:
আধুনিক নারীবাদ হাজার বছরের পুরনো 'পিতৃতন্ত্র' (Patriarchy)-র মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো পরিবর্তনের দাবি জানায়। এটি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে যা নারীকে পণ্য হিসেবে গণ্য করে বা তাকে পুরুষের অধীনস্ত মনে করে।

৬. লিঙ্গীয় ভূমিকা পুনর্গঠন:
প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় 'নারী মানেই নমনীয়' এবং 'পুরুষ মানেই কঠোর'—এই গণ্ডি ভাঙা আধুনিক নারীবাদের অন্যতম লক্ষ্য। এটি বিশ্বাস করে যে জেন্ডার বা লিঙ্গীয় ভূমিকা একটি সামাজিক নির্মাণ (Social Construct)। নারী বা পুরুষকে সমাজ নির্ধারিত কোনো নির্দিষ্ট ছাঁচে বন্দি না রেখে তাদের রুচি ও মেধা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত।

৭. ডিজিটাল নিরাপত্তা ও প্রতিনিধিত্ব:
অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নারীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য (Cyber Bullying), হয়রানি এবং পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে নারীকে অবমাননা করার বিরুদ্ধে আধুনিক নারীবাদ সোচ্চার। একই সাথে প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়।

৩.৪ পাশ্চাত্য সমাজে নারীবাদের প্রভাব ও তার বাস্তবতা

বর্তমান নারীবাদের কিছু ধারা নারীকে সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ প্রমাণ করতে গিয়ে নারীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও পারিবারিক ভূমিকার গুরুত্বকে অস্বীকার করছে। সমঅধিকারের নামে অনেক ক্ষেত্রে নারীর প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। পাশ্চাত্য নারীবাদের প্রভাবে যৌন স্বাধীনতা, পর্দাহীনতা, গর্ভপাত ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে স্বাধীনতা হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে, যার ফলে পরিবার ভাঙন, একক মাতৃত্ব, নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার, সহিংসতা ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
পাশ্চাত্য সমাজে নারীবাদ শুরু হয়েছিল নারীর প্রতি দীর্ঘদিনের বৈষম্য, নিপীড়ন ও সামাজিক অবমূল্যায়নের প্রতিবাদ হিসেবে। নারীর শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার, ভোটাধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মতো বহু ইতিবাচক পরিবর্তনে এ আন্দোলনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে সময়ের সাথে সাথে নারীবাদের কিছু ধারা এমন এক চরম ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ভোগবাদী সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করেছে, যার ফলে

পরিবার, নৈতিকতা, সম্পর্ক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেন। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজের বিভিন্ন সামাজিক বাস্তবতা, গবেষণা ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এই সংকটকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরছে।

১. পারিবারিক কাঠামোর ভাঙন ও একক অভিভাবকত্ব (Single Parent):

উগ্র নারীবাদের একটি বড় সমালোচনা হলো, এটি প্রথাগত পারিবারিক কাঠামোকে "পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়নের হাতিয়ার" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এর ফলে পাশ্চাত্য সমাজে বিয়ে এবং যৌথ পরিবারের প্রতি একধরনের অনীহা তৈরি হয়েছে।

- বিবাহবিচ্ছেদের উচ্চ হার: পাশ্চাত্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার অত্যন্ত বেশি (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪০-৫০%)। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, চরম স্বাবলম্বিতা এবং "কাউকে ছাড়া একাই ভালো থাকা"র নারীবাদী ধারণা অনেক ক্ষেত্রে ছোটখাটো পারিবারিক দ্বন্দ্বকেও বিচ্ছেদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
- একক অভিভাবকত্ব ও শিশু মনস্তত্ত্ব: Pew Research Center-এর উপাত্ত অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩%) শিশু একক অভিভাবকের (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মায়ের) কাছে বড় হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা দেখায় যে, বাবা-মায়ের যৌথ ছত্রছায়া ছাড়া বড় হওয়া শিশুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা, মানসিক বিষণ্ণতা এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

২. “হুকআপ কালচার” ও অনৈতিক সম্পর্কের বিস্তার:

পাশ্চাত্য সমাজে “casual relationship” বা দায়বদ্ধতাহীন সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে তোলার পেছনে আধুনিক নারীবাদের কিছু ধারার গভীর প্রভাব রয়েছে। এর ফলে তরুণ সমাজের মধ্যে “hookup culture” বা সাময়িক আকর্ষণের সংস্কৃতি ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে, যেখানে সম্পর্কের ভিত্তি দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ববোধ নয়।

- **মানসিক অনিশ্চয়তা:** বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, এই সংস্কৃতি অনেক তরুণীর মধ্যে মানসিক অনিশ্চয়তা, আত্মসম্মানবোধের সংকট (Low Self-esteem) এবং স্থায়ী সম্পর্ক নিয়ে ভীতি তৈরি করছে।
- **ভোগবাদ ও ক্ষণিক আবেগ:** এর ফলে নারী-পুরুষ সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে ভালোবাসা, দায়িত্ব ও পারিবারিক স্থিতির পরিবর্তে নিছক ভোগবাদ ও ক্ষণিক আবেগের উপর দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, যা সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করছে।

৩. স্বাধীনতার নামে নারীর পণ্যায়ন ও সৌন্দর্যভিত্তিক মূল্যায়ন:

নারীবাদ নারীকে স্বাধীনতার নামে কর্মক্ষেত্র ও জনজীবনে এনেছে—এটি যেমন ইতিবাচক, তেমনি এর একটি অন্ধকার পিঠও রয়েছে। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী সংস্কৃতি নারীবাদের "দেহ নিয়ে স্বাধীনতার" স্লোগানকে পুঁজি করে নারীকে বিজ্ঞাপন, বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভোগ্যপণ্যের মতো উপস্থাপন করছে।

- **বাহ্যিক সৌন্দর্যের অতি-মূল্যায়ন:** নারীর ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান বা চারিত্রিক গুণের চেয়ে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও শারীরিক আকর্ষণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফ্যাশন, চলচ্চিত্র এবং সোশ্যাল মিডিয়া (যেমন Instagram বা OnlyFans সংস্কৃতি) নারীদেহকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করছে।
- **মানবিক সত্তার অবমাননা:** এর ফলে নারীর মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রেই একটি স্বতন্ত্র "মানবিক সত্তা" থেকে পুঁজিবাদী বাজারের "দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনা" বা পণ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

৪. মানসিক স্বাস্থ্য সংকট, নিঃসঙ্গতা ও 'The Paradox of Female Happiness':

অত্যধিক ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রথাগত বন্ধনহীনতা এবং সম্পর্কের অস্থিরতা পাশ্চাত্যে এক নতুন নিঃসঙ্গতা-সংকট (Loneliness Epidemic) তৈরি করেছে।

- **সম্পর্ক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া:** সাম্প্রতিক জরিপগুলোতে দেখা যায়, জেনারেশন-Z (Gen-Z) তরুণ-তরুণীদের একটি বড় অংশ সম্পর্ক ও ডেটিং থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তারা "situationship", "ghosting" ও অস্থায়ী সম্পর্কের সংস্কৃতিতে হতাশ হয়ে পড়ছে।

অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার তরুণীদের ওপর পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক সমাজে একাকীত্ব ও সম্পর্কের অনিশ্চয়তা নারীদের তীব্র মানসিক চাপে ফেলছে। ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়ার অর্থনীতিবিদদের একটি বিখ্যাত গবেষণা ("The Paradox of Declining Female Happiness") দেখায় যে, ১৯৭০-এর দশকের তুলনায় বর্তমানে পাশ্চাত্যের নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতা অনেক বাড়লেও, তাদের সামগ্রিক সুখ বা মানসিক তৃপ্তির গ্রাফ দিন দিন নিচে নেমে গেছে।

৫. মাতৃত্ব ও সন্তান গ্রহণে অনাগ্রহ (The Demographic Winter):

পাশ্চাত্যের অনেক সমাজে বর্তমানে "child-free lifestyle" বা সন্তানহীন জীবনযাপন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে অনেক নারী মাতৃত্বকে "বোঝা" বা অগ্রগতির "বাধা" হিসেবে দেখতে শুরু করেছে।

- **জন্মহারের মহাবিপর্যয়:** এর ফলে ইউরোপ, আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়া (যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান) এর বহু দেশে জন্মহার আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় জন্মহার ০.৭২-এ নেমে এসেছে এবং ইউরোপের কোনো দেশই জনসংখ্যা টিকিয়ে রাখার ন্যূনতম হার (২.১) বজায় রাখতে পারছে না।
- **অর্থনৈতিক সংকট:** তরুণ কর্মক্ষম জনসংখ্যা কমে যাওয়ায় এই উন্নত দেশগুলো চরম বার্ধক্যজনিত ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়ছে। ফলে সরকারগুলো মানুষকে বিয়ে ও সন্তান গ্রহণে উৎসাহ দিতে কোটি কোটি ডলারের আর্থিক প্রণোদনা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

৬. নারী-পুরুষ সম্পর্কের সংঘাত বৃদ্ধি ও জেন্ডার মেরুকরণ:

আধুনিক নারীবাদের কিছু চরমপন্থী ধারা নারী-পুরুষকে পরস্পরের সহযোগী বা পরিপূরক নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এর ফলে পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতার পরিবর্তে সংঘাত, অবিশ্বাস ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **অনলাইন প্রবণতা (Trends):** বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে "boysober" (পুরুষদের থেকে দূরে থাকা), "anti-men culture" বা চরম সম্পর্কবিমুখতার মতো অনলাইন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। পুরুষদের সহজাত আচরণকে "টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি" বলে ঢালাও সমালোচনা করায় পুরুষরাও নারীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখছে।
- **রাজনৈতিক বিভাজন:** ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, পাশ্চাত্যের তরুণ সমাজ রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে তীব্র দুই ভাগে বিভক্ত—তরুণীরা দিন দিন অতি-বামপন্থী/প্রগতিশীল এবং তরুণরা চরম রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকছে। এই আদর্শিক সংঘাত সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ককে ধ্বংস করছে।

পরিশেষে বলা যায়, নারীবাদের আধুনিক ও চরমপন্থী রূপ পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও পারিবারিক ভিত্তিকে এক চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের মোড়কে যে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভোগবাদী সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে, তা আজ খোদ পাশ্চাত্য সমাজকেই ভেতর থেকে ভেঙে ফেলছে। বাস্তবতার এই নির্মম চিত্রটি প্রমাণ করে যে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম, নৈতিক মূল্যবোধ এবং পারিবারিক সংহতিকে অস্বীকার করে কোনো আদর্শ বা আন্দোলন কখনোই দীর্ঘমেয়াদে সমাজের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

অধ্যায়:৪: ইসলাম ও নারীবাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৪.১ ইসলাম বনাম নারীবাদের মূল পার্থক্য

ইসলামে নারীর অধিকার এবং আধুনিক নারীবাদের মধ্যকার পার্থক্য কোনো সাধারণ মতাদর্শিক পার্থক্য নয়, বরং এটি সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার এক মৌলিক ব্যবধান। ইসলাম নারীকে দিয়েছে আসমানি মর্যাদা, আর নারীবাদ নারীকে ঠেলে দিয়েছে এক অস্থির ও কৃত্রিম সংঘাতের দিকে।

১. সম্মানের ভিত্তি: সৃষ্টিগত মর্যাদা বনাম পণ্য ও সস্তা প্রতিযোগিতা

- **ইসলাম:** ইসলামে নারী কোনো সস্তা পণ্য নয়, বরং সে সম্মানের আধার। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পুরুষ ও নারী একে অপরের পরিপূরক। ইসলাম নারীকে ‘মা’ হিসেবে জান্নাতের চাবিকাঠি, ‘কন্যা’ হিসেবে জান্নাতের সুসংবাদ এবং ‘স্ত্রী’ হিসেবে অর্ধেক দ্বীন পূর্ণকারী হিসেবে অভিষিক্ত করেছে।
- **নারীবাদ:** নারীবাদ নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এটি নারীকে ঘর থেকে বের করে সস্তা শ্রমে বাধ্য করে এবং স্বাধীনতার নামে তাকে করপোরেট দুনিয়ার বিজ্ঞাপনের পণ্যে পরিণত করেছে। যা প্রকারান্তরে নারীর সহজাত কমনীয়তা ও মর্যাদাকেই ধ্বংস করছে।

২. অধিকার ও দায়বদ্ধতা: ন্যায়বিচার বনাম কৃত্রিম সমতা

- **ইসলাম:** ইসলাম 'সমতা' (Equality) নয়, বরং 'ন্যায়বিচার' (Equity) নিশ্চিত করে। নারীর জীবনের সমস্ত আর্থিক দায়ভার বাবা, ভাই বা স্বামীর ওপর অর্পণ করে তাকে দুশ্চিন্তামুক্ত ও নিরাপদ জীবন দিয়েছে। উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিতে নারীকে যে অংশ দেওয়া হয়েছে, তা তার কোনো খরচ ছাড়াই একান্ত নিজস্ব সম্পদ।
- **নারীবাদ:** নারীবাদের তথাকথিত সমতা নারীর ওপর দ্বিগুণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। তাকে ঘরের কাজের পাশাপাশি বাইরে গিয়েও উপার্জনের কঠিন লড়াই করতে হয়। এটি নারীকে অধিকার দেওয়ার নামে আসলে তাকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে পুরুষকে অব্যাহতি দেওয়ার একটি চক্রান্ত মাত্র।

৩. নিরাপত্তা ও শালীনতা: হিজাব বনাম অসংযত জীবন

- **ইসলাম:** পর্দার বিধান নারীর জন্য কোনো বন্দিত্ব নয়, বরং এটি একটি সুরক্ষা কবজ। ইসলাম চায় না কোনো কুনজর নারীর পবিত্রতাকে কলুষিত করুক। হিজাব বা পর্দা নারীকে একটি রাজকীয় গাম্ভীর্য দান করে, যা তাকে সমাজের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিরাপদ রাখে।
- **নারীবাদ:** নারীবাদ স্বাধীনতার নামে শালীনতার দেয়াল ভেঙে দিয়েছে। এটি নারীকে প্রলুব্ধ করে এমন এক জীবনধারার দিকে যেখানে নৈতিকতার চেয়ে দেহ প্রদর্শনকে বড় করে দেখা হয়। এর ফলে সমাজ আজ ধর্ষণ, পরকীয়া ও পারিবারিক ভাঙনের মতো ভয়াবহ সংকটে নিমজ্জিত।

৪. পারিবারিক কাঠামো: প্রশান্তির নীড় বনাম বিশৃঙ্খলা

- **ইসলাম:** ইসলাম একটি সুশৃঙ্খল পারিবারিক কাঠামোর কথা বলে, যেখানে নারী হলো গৃহের রাণী। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে একটি সুন্দর প্রজন্ম গড়ে ওঠে। ইসলামে পরিবার হলো প্রশান্তির কেন্দ্রবিন্দু।
- **নারীবাদ:** নারীবাদ পরিবার প্রথাকে একটি জেলখানা হিসেবে চিত্রায়িত করে। এটি নারীকে অবাধ্য হতে এবং ঘর ভাঙতে প্ররোচিত করে। নারীবাদের প্রভাবে আজ পশ্চিমা বিশ্বে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, মায়েরা নিঃসঙ্গ হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে ধুঁকছেন এবং সন্তানরা পিতৃত্বের পরিচয় হারিয়ে বিপথগামী হচ্ছে।

৫. আধ্যাত্মিক মুক্তি বনাম বস্তুগত দাসত্ব

- **ইসলাম:** ইসলামে নারীর মূল লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ইবাদত-বন্দেগি ও নৈতিকতায় একজন নারী পুরুষের চেয়েও উপরে যেতে পারেন। এটি তাকে আত্মিক শান্তি ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়।
- **নারীবাদ:** নারীবাদ একটি বস্তুবাদী চিন্তা। এটি নারীকে শেখায় তার দেহ এবং ভোগই সব। পরকালহীন এই মতাদর্শ নারীকে এক অন্তহীন অতৃপ্তির দিকে ঠেলে দেয়, যেখানে দিনশেষে মানসিক বিষণ্নতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ইসলাম নারীকে দিয়েছে একটি নিরাপদ দুর্গ এবং আসমানি সম্মান। আর নারীবাদ সেই দুর্গ ভেঙে নারীকে নামিয়ে এনেছে অনিরাপদ রাস্তায়। নারীর প্রকৃত মুক্তি ও সম্মান নারীবাদের গোলকধাঁধায় নয়, বরং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলেই নিহিত।

৪.২ ইসলামে নারীর অধিকার বিষয়ে প্রচলিত বিভ্রান্তি ও তার বাস্তবতা

বর্তমান বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে অপপ্রচার চালানো হয়, তার অন্যতম হলো "ইসলামে নারীর অধিকার"। পশ্চিমা মিডিয়া, সেক্যুলার চিন্তাধারা, নারীবাদী আন্দোলন এবং ইসলামোফোবিক গোষ্ঠীগুলো প্রায়ই ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন ইসলাম নারীকে অবদমিত, অধিকারহীন ও পুরুষের দাসে পরিণত করেছে। তারা "স্বাধীনতা" বলতে বুঝায় সীমাহীন ভোগবাদ ও নৈতিক বাধাহীন জীবনকে; পক্ষান্তরে ইসলাম স্বাধীনতাকে নৈতিকতা, দায়িত্ব ও মানবিক ভারসাম্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। ফলে ইসলামি বিধানকে তারা "নারী নিপীড়ন" হিসেবে উপস্থাপন করে।

কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামই হলো পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা নারীকে দিয়েছে মানবিক মর্যাদা, আধ্যাত্মিক সম্মান, সম্পদের অধিকার, পারিবারিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক অবস্থান।

নিচে ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে সবচেয়ে প্রচলিত কিছু বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার এবং তার সঠিক ব্যাখা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার বা সম্পত্তির অংশ পুরুষের অর্ধেক, যা বৈষম্যমূলক

দাবি: কন্যাসন্তান কেন পুত্রসন্তানের অর্ধেক সম্পত্তি পাবে? এটি নারীর অর্থনৈতিক অবমূল্যায়ন।

সঠিক ধারণা: ইসলামি শরিয়তের উত্তরাধিকার আইন অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ এবং এটি নির্ধারিত হয় ব্যক্তির অর্থনৈতিক দায়িত্বের (Financial Liability) ওপর ভিত্তি করে, লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করে নয়। সূরা আন-নিসার **১১** নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।"

বাস্তব ও যৌক্তিক খণ্ডন:

- **আর্থিক দায়বদ্ধতা:** ইসলামে পুরুষের ওপর পরিবারের যাবতীয় খরচ (ভরণপোষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, স্ত্রীর মোহরানা) বহন করা ফরজ বা বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে, নারীর অর্জিত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে

নিজের বা পরিবারের এক আনা খরচ করারও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। তার টাকা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব সঞ্চয়।

- **সমীকরণের ভারসাম্য:** একজন নারী বিয়ের আগে বাবা ও ভাইয়ের অধীনে থাকেন, বিয়ের পর স্বামীর অধীনে। ফলে, পুরুষকে তার প্রাপ্ত সম্পত্তির একটি বড় অংশ স্ত্রী ও সন্তানদের পেছনে খরচ করতে হয়, আর নারী যা পান তা কেবলই তার মুনাফা।
- **ব্যতিক্রম:** এমন ৩০টিরও বেশি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে নারী পুরুষের সমান অথবা পুরুষের চেয়ে বেশি সম্পত্তি পান। যেমন: মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার মা ও বাবা উভয়েই সমান অংশ (৬ ভাগের **১** ভাগ) পান [সূরা নিসা: **১১**]। অতএব, কেবল একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র (ভাই-বোন) দেখিয়ে পুরো ব্যবস্থাটিকে বৈষম্যমূলক বলা নিছক অজ্ঞতা।

২. ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি দিয়ে নারীকে অপমান করা হয়েছে

দাবি: ইসলাম পুরুষকে চারটি বিয়ে করার লাইসেন্স দিয়েছে, যা নারীর প্রতি অন্যায়।

সঠিক ধারণা: ইসলামই পৃথিবীর একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা বিয়ের সংখ্যার ওপর সর্বোচ্চ সীমা (অনূর্ধ্ব চার) নির্ধারণ করেছে এবং এক বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করেছে। সূরা আন-নিসার **৩** নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"তবে যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে (স্ত্রীদের মধ্যে) সুবিচার করতে পারবে না, তবে মাত্র একজনকেই (বিয়ে করো)।"

বাস্তব ও যৌক্তিক খণ্ডন:

- **অনুমতি, নির্দেশ নয়:** বহুবিবাহ ইসলামে কোনো 'ফরজ' বা আবশ্যক বিষয় নয়, এটি একটি শর্তসাপেক্ষ অনুমতি (Conditional Permission)। **শর্তটি হলো—** সব স্ত্রীর সাথে নিখুঁত সমতা ও সুবিচার কায়েম করা, যা অত্যন্ত কঠিন।
- **সামাজিক ও ডেমোগ্রাফিক বাস্তবতা:** ড. জাকির নায়েক বিশ্ব পরিসংখ্যানের আলোকে দেখিয়েছেন যে, প্রাকৃতিকভাবেই বিশ্বে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা সাধারণত বেশি থাকে (যুদ্ধ, দুর্ঘটনা ও গড় আয়ুর কারণে পুরুষ দ্রুত মারা যায়)। যদি প্রতি পুরুষ কঠোরভাবে কেবল একজন নারীকে বিয়ে করে, তবে কোটি কোটি নারী বৈধ পারিবারিক জীবন, নিরাপত্তা ও মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

- **পশ্চিমা সমাজের দ্বিচারিতা:** পশ্চিমা সমাজে আইনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হলেও, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক বা উপপত্নী (Mistresses) রাখা খুবই সাধারণ, যেখানে নারীরা কোনো আইনি বা সামাজিক অধিকার পায় না। ইসলাম নারীকে 'উপপত্নী' হিসেবে অবমাননা না করে, শরিয়তের অধীনে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারসহ 'স্ত্রী'র স্বীকৃতি দেয়।

৩. ইসলামে নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক

দাবি: দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান, এর মানে ইসলাম নারীকে মানসিকভাবে দুর্বল বা কম বুদ্ধিসম্পন্ন মনে করে।

সঠিক ধারণা: এই ধারণাটি এসেছে সূরা আল-বাকারার ২৮২ নম্বর আয়াত (ঋণের আয়াত) থেকে। যেখানে বলা হয়েছে:

"...তাহলে দুজন পুরুষ সাক্ষী করো। যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারী—যাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট। যাতে তাদের একজন ভুলে গেলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"

বাস্তব ও যৌক্তিক খণ্ডন:

- **কেবল আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:** এই নিয়মটি সাধারণ কোনো অপরাধ বা ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে নয়, এটি কেবল জটিল বাণিজ্যিক বা আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তৎকালীন (এবং অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান) সমাজে নারীরা সাধারণত জটিল ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ ও বাজার কাঠামোর সাথে পুরুষদের মতো সরাসরি সম্পৃক্ত থাকত না।
- **মনস্তাত্ত্বিক ব্যাকআপ (স্মরণ করিয়ে দেওয়া):** আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, নারী জাতিগতভাবে কম বুদ্ধিমান তাই নয়, বরং ব্যবসার মতো অপরিচিত ক্ষেত্রে একজন যেন অন্যজনকে 'সহায়তা বা স্মরণ' করিয়ে দিতে পারে (To Corroborate)। এখানে দ্বিতীয় নারীটি মূল সাক্ষী নয়, সে মূলত একজন 'সহায়ক বা ব্যাকআপ'।
- **যেখানে নারীর সাক্ষ্য একক বা অগ্রাধিকার পায়:** চাঁদ দেখা, নারীর একান্ত ব্যক্তিগত বা শারীরিক বিষয়, এবং শিশুর জন্ম বা বংশপরিচয় নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়, সেখানে পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণই করা হয় না। ইমাম ইবনে কায়্যিম (রহ.) এবং আধুনিক ফকিহরা স্পষ্ট

করেছেন যে, সাক্ষ্যের উদ্দেশ্য হলো সত্য উদঘাটন করা; যেখানে নারী বেশি অভিজ্ঞ, সেখানে তার সাক্ষ্যই প্রধান।

৪. ইসলামে স্বামীকে স্ত্রী পেটানোর বা শারীরিক নির্যাতনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে

দাবি: সূরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াত অনুযায়ী স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের মারধর করার অধিকার পায়।

সঠিক ধারণা: সূরা আন-নিসার ৩৪ নম্বর আয়াতে অবাধ্যতা ও চরম পারিবারিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে তিনটি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে:

১. প্রথমে তাদের সদুপদেশ দাও, ২. (তাতে কাজ না হলে) শয্যা ত্যাগ করো, ৩. (তাতেও না হলে) তাদের 'দারাবা' (ضرب) করো।

বাস্তব ও যৌক্তিক খণ্ডন:

- **'দারাবা' শব্দের অপব্যাখ্যা ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবনে কখনো কোনো নারী বা শিশুকে আঘাত করেননি। তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি মারতেই হয় তবে তা হবে 'দারবান গায়রা মুবাররিহ' (غير مبرح)—যার অর্থ এমন আঘাত যা কোনো দাগ ফেলবে না, ক্ষত করবে না এবং মুখে বা চমৎকার অঙ্গে করা যাবে না।
- **মিসওয়াক দিয়ে মৃদু আঘাত:** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এই মৃদু আঘাত কেমন? তিনি বলেছিলেন, "মিসওয়াক (টুথব্রাশ সদৃশ ডাল) বা হাত দিয়ে আলতো স্পর্শ করা।" এটি কোনো শারীরিক শাস্তি বা নির্যাতন নয়, এটি কেবল স্বামীর চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশের একটি প্রতীকী (Symbolic) মাধ্যম।
- **পশ্চিমা নারীবাদীদের অজ্ঞতা:** ইসলাম যেখানে সর্বোচ্চ রেগে গেলেও মিসওয়াক দিয়ে ছোঁয়ার কথা বলে দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা করতে বলে, সেখানে পশ্চিমা সমাজে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বা পারিবারিক নির্যাতনের হার পরিসংখ্যানগতভাবেই বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ।

৫. হিজাব বা পর্দা নারীর স্বাধীনতা হরণ করে এবং এটি অবদমনের প্রতীক

দাবি: হিজাব ও বোরকা নারীকে বন্দি করে রাখে এবং তাদের পুরুষের চেয়ে নিচু স্তরের ভাবা হয়।

সঠিক ধারণা: ইসলামে শালীনতার বিধান নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। সূরা আন-নূরের ৩০ ও ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ প্রথমে পুরুষকে তার দৃষ্টি অবনত রাখার

নির্দেশ দিয়েছেন, তারপর নারীকে তার দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং হিজাব বা শালীন পোশাক পরিধান করতে বলেছেন।

বাস্তব ও যৌক্তিক খণ্ডন:

- **সুরক্ষা ও সম্মান, বন্দিত্ব নয়:** হিজাব নারীকে সমাজের কুদৃষ্টি, হেনস্থা এবং অবজেক্টিফিকেশন (পণ্য হিসেবে ব্যবহার) থেকে রক্ষা করে। এটি নারীকে তার বাহ্যিক অবয়বের চেয়ে তার মেধা ও ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সমাজে মূল্যায়িত হতে সাহায্য করে।
- **পশ্চিমা স্বাধীনতার ফাঁদ:** পশ্চিমা সমাজ নারীকে 'স্বাধীনতার' নামে ফ্যাশন ও বিনোদন শিল্পের পণ্য বানিয়ে ফেলেছে। ইসলাম নারীকে মুক্ত করেছে যেন তাকে কেউ ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখতে না পারে। হিজাব পরিধানকারী লাখ লাখ নারী আজ শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে চিকিৎসা, প্রকৌশল, শিক্ষা ও গবেষণায় শীর্ষস্থানে অবদান রাখছেন।

৬. ইসলামে নারীকে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া যায় এবং ডিভোর্সের অধিকার কেবল পুরুষের

দাবি: মুসলিম মেয়েরা নিজের পছন্দে বিয়ে করতে পারে না এবং স্বামী চাইলেই একতরফা তালাক দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু নারী পারে না।

সঠিক ধারণা: ইসলামি শরিয়তে বিয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক পবিত্র চুক্তি, যেখানে কনের স্বাধীন ও স্পষ্ট সম্মতি (Consent) ছাড়া বিয়ে সম্পূর্ণ বাতিল বা অবৈধ। একইভাবে, দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হলে নারীও শরিয়তের আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে পুরুষদের মতোই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।

বাস্তব ও যৌক্তিক খণ্ডন:

- জোরপূর্বক বিয়ে বাতিল: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্পষ্ট নির্দেশ হলো—নারীর অনুমতি ছাড়া তাকে বিয়ে দেওয়া যাবে না (সহীহ বুখারী: ৫১৩৬)। এক আনসারী নারী এসে অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁর পিতা তাঁর অমতে বিয়ে দিয়েছেন; রাসুল (সা.) তৎক্ষণাৎ সেই বিয়ে বাতিল করে দেন (সহীহ বুখারী: ৫১৩৮)। অপর এক কুমারী মেয়ের ক্ষেত্রেও রাসুল (সা.) তাকে বিয়ে বহাল রাখা বা ভেঙে দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন (আবু দাউদ: ২০৯৬)।
- নারীর বিচ্ছেদের অধিকার (খুলা): স্বামী অত্যাচারী না হলেও, স্ত্রী যদি কেবল মানসিক অমিল বা অপছন্দের কারণে সংসার করতে না চান, তবে তিনি

মোহরানা ফিরিয়ে দিয়ে আদালতের মাধ্যমে বিচ্ছেদ নিতে পারেন, যাকে ‘খুলা’ (Khula) বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খুলার আবেদনে রাসুল (সা.) সাহাবি সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রীকে এই অধিকার দিয়েছিলেন (সহীহ বুখারী: ৫২৭৩)।

- তালাকে তাফউইয ও ফাসখ: বিয়ের সময় কাবিননামায় (যেমন প্রচলিত কাবিননামার ১৮ নং কলামে) নারী চাইলে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা নিজের কাছে রেখে দিতে পারেন (তাফউইয), যা দিয়ে তিনি সরাসরি বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। এছাড়া স্বামী নিখোঁজ হলে বা নির্যাতন করলে আদালতের মাধ্যমে বিয়ে রদ (ফাসখ) করার পূর্ণ আইনি অধিকার নারীর রয়েছে।

সুতরাং, যদি কোনো মুসলিম পুরুষ বা সমাজ যদি ইসলামি আইন না মেনে নারীর ওপর জুলুম করে, তবে তার দায় ইসলামের নয়, বরং সেই ব্যক্তির। ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (উপার্জন ও ব্যবসার অধিকার), আইনি অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং সম্মানের সর্বোচ্চ আসন (মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত) দিয়েছে এমন এক সময়ে, যখন পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না। পশ্চিমা নারীবাদ যেখানে পুরুষ ও নারীকে একে অপরের ‘প্রতিপক্ষ’ হিসেবে দাঁড় করায়, ইসলাম সেখানে উভয়কে একে অপরের ‘পরিপূরক ও বন্ধু’ (সূরা তাওবাহ: ৭১) হিসেবে মর্যাদা দেয়।

অধ্যায়:৫: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ

৫.১ মুসলিম বিশ্বে নারীবাদের সূচনা ও বিস্তার

মুসলিম সমাজে নারীবাদের সূচনা একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। এটি হঠাৎ করে জন্ম নেয়নি; বরং ঔপনিবেশিক শাসন, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ সংকট—সবকিছুর সম্মিলিত প্রভাবে মুসলিম নারীবাদ বা "ইসলামিক ফেমিনিজম"-এর উদ্ভব ঘটে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে যখন এই আন্দোলন অস্তিত্ব লাভ করলো এর অব্যবহিত পরেই অনেক মুসলিম দেশে এর উপস্থিতি বেশ জোরালোভাবেই টের পাওয়া গেলো। তখনকার ইউরোপিয়ান উপনিবেশ শাসিত ইন্ডিয়া, আরব ও আফ্রিকান মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশভক্ত একশ্রেণীর এলিট ছিলেন, যারা গতকালের ইউরোপে আবিষ্কৃত যেকোন চিন্তা বা মতবাদকে পরদিনই নিজের দেশে আমদানি করতেন আলোকায়নের নামে। তাদের হাত ধরেই নারীবাদের আগমনও ঘটে । মিশরের বিখ্যাত আইনজীবী ও লেখক কাসেম আমীন তার "নারীর মুক্তি" (তাহরীরুল মারআহ) বইটি প্রকাশ করেন ১৮৯৯ সালে। বইটি তখন সব মহলেই হৈচৈ ফেলে দেয়। একই সময়ে মিশর, সিরিয়া ও লেবাননের যেসব "সংস্কারপন্থি" ধর্মীয় পন্ডিত ছিলেন তারাও এ বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন। জামালুদ্দীন আফগানী, মোহাম্মাদ আব্দুহু, রশিদ রেজা, রিফায়া তাহতাবী প্রমূখ ছিলের অগ্রণী ভূমিকায়। তারা ইসলামে নারী প্রশ্নে এমন সব প্রস্তাবনা সামনে আনলেন যা ইউরোপের নারীবাদি আন্দোলনের বিচারেও অনেক অগ্রগামী ছিলো। যদিও তারা "নারীবাদ" নাম গ্রহন না করেই এই আন্দোলন চালিয়েছেন। তাদের সাথে ছিলো ঔপনিবেশিকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার হাত। মিশরের ইংরেজ শাসক লর্ড ক্রোমার মুসলিম নারীদের দুঃখ আর ব্যাথা বেদনার কাহিনী লিখতে লাগলেন এবং নিজেকে তাদের উদ্ধারকারী হিসেবে উপস্থাপন করতে লাগলেন। যদিও ক্রোমারের নিজের দেশ ইংল্যান্ডে তখনও নারীদের ভোটাধিকারই দেয়া হয়নি। অন্যান্য অধিকারের কথা বাদই থাক।

কিন্তু হুবহু ইউরোপের আদলে মুসলিম দেশগুলোতেও নারীবাদী আন্দোলন সংঘটিত ও সুসংহত হয়ে উঠতেও খুব বেশি সময় লাগেনি। যারা সরাসরি পশ্চিমা সেক্যুলার

নারীবাদকে গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের প্রতি উপর্যপুরি হামলা চালিয়েছেন। নাওয়াল সা'দাবি, হুদা শা'রাবি, দোরিয়া শফিক, কিংবা সামীরা মুসার মতো নারীবাদী চিন্তকরা সেক্যুলার জায়গা থেকে ধর্ম ও আরব সমাজের তির্যক সমালোচনা করেছেন। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের উত্থানকালীন সময়েই এর আরও বেশকিছু শাখা প্রশাখা গড়ে উঠেছে, বিশেষত অ-ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে। Black Feminism, Radical Feminism, Marxist Feminism, liberal Feminism, Post Colonial Feminism ইত্যাদি। কিন্তু দিনশেষে এর সবগুলোই লক্ষ্য ও আদর্শের বিচারে এক ও অভিন্ন। হয়তো পার্থক্য কেবল নাম ও চর্চার ধরণে। এরই ধারাবাহিকতায় নব্বইয়ের দশকে Islamic Feminism নামক ধারণার উদ্ভব ঘটে, প্রধানত ইরান ও আরবে। ইসলামী নারীবাদ' পরিভাষাটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় **১৯৯২** সালে তেহরান থেকে প্রকাশিত নারী বিষয়ক ম্যাগাজিন 'জানান' -এ দুজন ইরানি লেখিকা জিবা মীর হুসাইনি ও আফসানা নজমাবাদীর লেখায়। এরপর **১৯৯৬** সালে সৌদি লেখিকা মী ইমানির বই 'ইসলাম ও নারীবাদ' প্রকাশিত হয়, যেখানে এই পরিভাষাটি ব্যবহার হয়।

এর বাইরে আমেরিকান নারীবাদি লেখিকা মার্গট বাদরানকেও এর উদ্ভাবক হিসেবে ধরা হয়। **১৯৯৫** সালে তার বই "ইসলামে নারীবাদ" (Feminism In Islam) এ তিনি এই ধারণা প্রস্তাব করেন। একটা মজার ব্যাপার হলো সেক্যুলার নারীবাদ কিংবা ইসলামি নারীবাদ, এর সকল এক্টিভিস্ট, চিন্তক ও লেখক পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছেন। হয় তারা সেসব দেশে বসবাস করেন, নতুবা সেসব দেশের কোন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন, অধ্যাপনা করান, কিংবা অন্য কোন এজেন্সিতে কর্মরত আছেন।

৫.১.১ পাশ্চাত্য নারীবাদ ও ইসলামী নারীবাদ:

প্রচলিত পশ্চিমা নারীবাদ ও ইসলামী নারীবাদের মূল চিন্তা ও দাবিতে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকলেও দাবি-উপস্থাপন ও কর্মপন্থায় কিছু ভিন্নতা রয়েছে। লেবাননী গবেষক ও লেখিকা দিলাল বাজরি বলেন—'ইসলামী নারীবাদ পশ্চিমা নারীবাদের সমস্ত চিন্তাকে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ ও নিজের ভেতর ধারণ করলেও তারা সেটা অস্বীকার করে বলে, এটা ইসলাম।' নারীবাদ যেমন প্রচলিত সমস্ত প্রথা ও ধর্মকে পুরুষতান্ত্রিক

ব্যবস্থা হিসেবে দাবি করে, যা যুগ যুগ ধরে নারীকে নিপীড়িত শোষিত ও বঞ্চিত করার জন্যই তৈরি হয়েছে। ইসলামী নারীবাদের দাবিও একই। তবে সমস্যার মোকাবেলায় পশ্চিমা নারীবাদ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদির মতো লিবারেল ধারণাগুলোকে সামনে আনলেও ইসলামী নারীবাদ প্রাথমিকভাবে এর মোকাবেলা করতে চায় ভিন্নভাবে।

ইসলামী নারীবাদের মতে কোরআন ও হাদিসের সমস্ত প্রচলিত ব্যাখ্যা হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। ফলে কোরআন ও হাদীসকে নারীবাদের আলোকে অধ্যায়ন ও পুনর্পাঠ করতে হবে এবং নারীবান্ধব নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হবে। এই দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে ইসলামী নারীবাদ নতুনভাবে কোরআন-হাদিসের পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে চায়।

ইসলামি নারীবাদ ফিকহে ইসলামিকে পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সবচে বড় দায়ী হিসেবে সাব্যস্ত করে। তারা মনে করেন, ফুকাহায়ে কেরাম ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে নিজেদের পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য ভয়াবহ রকমের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। এবং নিজেদের সেইসব পক্ষপাতমূলক মতামতই শরিইয়াহর বিধান হিসেবে উম্মতের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। সম্প্রতি রীতা ফারাজ নামক এক লেবানিজ নারীবাদী লেখিকা একটি বই লিখেছেন, বইয়ের নাম হলো " ইমরাআতুল ফুক্কাহা ওয়া ইমরাআতুল হাদাসাহ", অর্থাৎ মুসলিম ফকীহদের নির্মিত নারী ধারণা এবং আধুনিকতায় নারী ধারনা। সেখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন ফকীহরা কিভাবে নিজস্ব ইজতেহাদ ও বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে নারীর কর্তাসত্ত্বাকে সম্পূর্ণরূপে নাই করে দিয়েছেন। অত:পর পশ্চিমা আধুনিকতা সেই হারানো কর্তৃত্বকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছে।

৫.১.২ ইসলামী নারীবাদ যেভাবে একজন মানুষকে কুফর ও রিদ্দাহর দিকে ধাবিত করে:

ইসলামী নারীবাদ কীভাবে একজন মানুষকে ধীরে ধীরে কুফর ও রিদ্দাহ পর্যন্ত নিয়ে যায়, তার বিররণ দিয়েছেন আমেরিকান মুসলিম একটিভিস্ট ড্যানিয়েল হাকীকাতজু। তার এক লেখায় তিনি দেখিয়েছেন ইসলামি নারীবাদ কিভাবে চারটি ধাপ অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত ধর্মহীন সেক্যুলার নারীবাদে পরিণত হয়। তিনি পাঁচটি স্তর বর্ণনা করেন, যার একেকটি স্তর অতিক্রম করে করে চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেন একজন মুসলিম নারীবাদী, সেখানে ধর্মের নানা বিধানকে সরাসরি অস্বীকার করেন। প্রথম ধাপে কিছু যৌক্তিক অভিযোগ দিয়েই শুরুটা হয়। মুসলিম পুরুষরা নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, নারীরা নিপীড়িত, নিগৃহীত। ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো এ নিয়ে কোনো কথা বলে না, কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না ইত্যাদি। বলাবাহুল্য যে, এমন সমস্যাগুলো কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তবে এর সমাধান কখনোই নারীবাদ নয়, বরং ইসলামের সঠিক জ্ঞানের চর্চা ও ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু যখন এর সমাধান হিসেবে নারীবাদকে গ্রহণ করা হয়, তখন মূলত একটা সমস্যার সমাধানে তার চেয়ে বড়ো আরেকটা সমস্যাকে আমদানি করা হয়।

প্রথম ধাপে নারীর বিভিন্ন অধিকারের বিষয়ে নানা অভিযোগ আপত্তির পর দ্বিতীয় ধাপে এই ব্যাপারগুলো মতাদর্শিক রূপ নেয়। তখন এমন কিছু নতুন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, যা আসলে বাস্তবতা বিবর্জিত। যেমন অমুক কনফারেন্সে কেন শুধু পুরুষদের রাখা হল, নারীদের কেন রাখা হলো না, কেন নারীদের পর্দা, হিজাব, শালীনতা বিষয়ে পুরুষরা বলবে? ইত্যাদি। এ পর্যায়ে এসে সমস্ত সমস্যার জন্য দায়ী করা হয় পুরুষতান্ত্রিকতা নামক এক অদৃশ্য জুজুকে। এই ধাপে আলোচনার কাঠামো গড়ে ওঠে এবং চালিত হয় পশ্চিমা নারীবাদী এবং লিবারেল অবস্থানকে কেন্দ্র করে। এ সময়ে নারীর প্রতি ইসলামের বিশেষ ও স্বতন্ত্র কিছু বিধান নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা যায় তাদের। যেমন পর্দা, হিজাব, নারীর ঘরের বাইরে যাওয়া, সাধারণ কর্মক্ষেত্রে কাজ করা, নারী-পুরুষের মেলামেশা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে অনেকটা অজ্ঞতা নিয়েই ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া হয়।

তৃতীয় ধাপে যখন একজন নারীবাদী জানতে পারে যে, নারী-বিষয়ক এসব স্বতন্ত্র বিধানগুলো আসলেই শরীয়াহ নির্দেশিত, তখন ইসলামী জ্ঞানব্যবস্থা নিয়েই সে

অভিযোগ তোলে। ইসলামী জ্ঞানের সিলসিলাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। যুগ যুগ ধরে চলে আসা মুসলিম স্কলারদের পুরুষতান্ত্রিক বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কোরআন ও হাদিসকে নতুন করে নারীবাদী ব্যাখ্যায় এনে নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবনের প্রয়োজনীতা উপলব্ধি হয়। এই ধারাবাহিকতার শেষ থেকেই তৈরি হয় চতুর্থ ধাপ।

চতুর্থ ধাপে একজন মুসলিম নারীবাদী লক্ষ্য করে শুধুমাত্র কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যেই না, বরং সরাসরি কোরআন ও হাদিসের টেক্সটে সুস্পষ্টভাবে এমন কিছু বিষয় আছে, যা নারীবাদের মানদণ্ডে টিকে না। যেমন সুরা নিসার ৩৪নং আয়াত, যেখানে আল্লাহ বলেছেন—‘পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন’। এমন অন্যান্য আয়াত, যেখানে অবাধ্যতার জন্য নারীদের বিছানা ত্যাগ ও তাদের মৃদু প্রহার করতে বলা হয়েছে, দুইজন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যর সমান বলা হয়েছে, উত্তরাধিকার আইনে পুরুষের অংশকে দ্বিগুণ করা হয়েছেন, আকল ও ধর্মে নারীর অপূর্ণাঙ্গতার কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি। এই ধাপে এসে যখন মুসলিম নারীবাদী দেখে যে, এসব বিষয়কে পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা বলে পার পাওয়া যাবে না, তখন সে সরাসরি এসব বিষয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। যেমন মালয়েশিয়ার মুসলিম নারীবাদী সংগঠন সিস্টার্স ইন ইসলামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আমিনা ওয়াদুদের মতে— ‘কুরআনে বর্ণিত স্পষ্ট যেসব আয়াতের বিকল্প ব্যাখ্যা নারীবাদীরা খুঁজে পাচ্ছেন না, সেসকল আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। তিনি বলেন— ‘ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন কিছু আয়াত পেয়েছি, যেগুলো অর্থ প্রকাশে অপর্যাপ্ত কিংবা অগ্রহণযোগ্য, যদিও সেসবের উপর অনেক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যেখানে ঐশী বাণী হিসেবে কুরআনের বিশেষ কিছু বক্তব্য সমস্যাযুক্ত মনে হবে, ‘সেখানে সুযোগ রয়েছে কুরআনের বক্তব্যকে প্রত্যাখান করার, জবাব দেয়ার, এমনকি ‘না’ বলার।

এভাবেই একজন মুসলিম নারীবাদী দিনশেষে সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। পঞ্চম ধাপে এসে তারা ধর্ম নয়, বরং সরাসরি স্রষ্টার উপর নানা অভিযোগ তুলে। যেমন, আল্লাহ যদি নারী ও পুরুষের ব্যাপারে সাম্যবাদী হন তাহলে নিজের ব্যাপারে কুরআনে কেন পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করলেন? আল্লাহ্ কেন প্রথমে আদমকে (আলাইহিস সালাম) তথা একজন পুরুষকে সৃষ্টি করলেন? কেন প্রথমে নারীকে সৃষ্টি করলেন না? শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন একজন পুরুষ? কেন নারী নন? কেন আল্লাহর ওয়াহি নারীর মাধ্যমে না এসে পুরুষের মাধ্যমে এল?

এভাবে একজন মুসলিম নারীবাদী তার চূড়ান্ত অবস্থা তথা কুফর ও রিদ্দাহের দিকে পৌঁছে যায়।

ইসলামী নারীবাদই এখন দ্বীন ত্যাগের সবচে বড় দরজায় পরিণত হয়েছে মুসলিম নারীদের জন্য। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাঃ থেকে কোন বিধান আসার পর এর অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের আগে তারা সেখানে সর্বাগ্রে নারী স্বার্থের তালাশ করেন। আল্লাহ্র আনুগত্যের চাইতে নিজেদের "স্বার্থ" রক্ষাই মূখ্য হয়ে দাড়িয়েছে তাদের জন্য।

৫.২ মুসলিম বিশ্বে নারীবাদের কুপ্রভাব

নারী স্বাধীনতা ও নৈতিক অধঃপতনের একটি প্রধান ও কার্যকর মাধ্যম হলো সিনেমা। "লাহোরের হিরামন্ডি জেলার প্রতিটি মেয়েরই আকাংখা হচ্ছে অভিনেত্রী হওয়া। তারা সকলেই চাচ্ছে চিত্রনায়িকা হতে। এই ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য তারা যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী আছে। এদের একটি বিরাট সংখ্যক মেয়ে তাদের নায়িকা হওয়ার আকাংখা পূরণের শর্তে তাথাকথিত সিনেমা পরিচালক ও প্রযোজকদের খুশী করার জন্য যে কোন জায়গায় উপস্থিত হতে রাজী রয়েছে। সিনেমা শিল্পের দ্বারা খুব সহজে ও সাধারণভাবে বিভ্রান্ত মেয়েলোক এরাই। এদের অধিকাংশই টুকিটাকি কিছু অভিনয়ের সুযোগ পেলেই খুশী। অতিরিক্ত বেশ কিছু মেয়ে এভাবেই সিনেমার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। এদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন অবশ্যি প্রতিষ্ঠাও পায়। শহরের অনেক হোটেলেই "শুভ সময়" এর কাজে ব্যবহৃত হয়। কতিপয় হোটেল পরিচালক থাকে কোটনার ভূমিকায়। অধিকাংশ রেস্তোরাঁ ব্যবহৃত হয় খদ্দেরের সাথে নষ্টা মেয়েদের সাক্ষাতের স্থান হিসেবে। এ সকল মেয়ে লোকদেরকে নগরীর বাস স্ট্যান্ডগুলোতেও দেখা যায়। শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলোও খদ্দের ধরার জন্য খুবই পরিচিত স্থান। প্রেক্ষাগৃহগুলো যে সিনেমা দেখা ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না তাও নয়। এ সকল ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা খুবই শিথিল।" (১৯৬৮ সালের ২৯ ও ৩০শে মার্চ তারিখে 'দি পাকিস্তান টাইমস'-এ প্রকাশিত 'লাহোরে বেশ্যাবৃত্তি' নামক প্রতিবেদন থেকে)।

নারী স্বাধীনতার পক্ষে পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং সিনেমার প্ররোচনা স্ত্রী ও সন্তানের মা হিসেবে নারীর ভূমিকাকে তাচ্ছিল্য ও খাটো করেছে। সন্তানের লালন-পালনের জন্য

নারীদের গৃহে অবস্থানকে এই প্রচারণা জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অর্ধেক জনশক্তির অনুপস্থিতির ফলে অমার্জনীয় ক্ষতির কারণ বলে বর্ণনা করেছে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে মুসলিম দেশসমূহে সহশিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে ছেলে মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ও যৌন অপরাধ প্রবণতা এমনভাবে বেড়েছে যে, তা অজস্র যুবক-যুবতীকে ধ্বংসের মুখোমুখি করে দিয়েছে এবং বিস্তর ঘটিয়েছে অসংখ্য পাপ কর্মের। সহশিক্ষা এই ভ্রমাত্মক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে জন্মগত কোন পার্থক্য নেই, সুতারাং উভয়কেই একই কর্মক্ষেত্রে অভিন্ন কাজের জন্য নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। ফলতঃ যে সকল মেয়ে সহ-শিক্ষা গ্রহণ করে তারা খুবই খারাপভাবে নিজেদেরকে বিবাহ ও মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করে। এরপরও নারী স্বাধীনতাবাদীরা বলে থাকেন মেয়েদের প্রাথমিক দায়িত্ব স্বামীর গৃহেই। এ কথার অন্য অর্থ দাঁড়ায়, আধুনিক নারীদেরকে দ্বৈত দায়িত্ব পালন করতে হবে। নিজের জীবিকার জন্য সারাক্ষণ ঘরের বাইরে কাজ করার পরও ঘরে ফিরে তাকে সন্তানের লালন-পালন, ঘরদোর সাজানো ও স্বামীর প্রয়োজন পূরণের মত অসম্ভব প্রায় সব বাধ্যবাধকতা পালন করতে হবে।

মুসলিম দেশসমূহে অধুনা পাশ্চাত্যের আইনের অনুরূপ যে পারিবারিক আইন পাশ করা হয়েছে, সে আইন কি বাস্তবিকভাবে আমাদের নারী সমাজের কোন উন্নয়ন ঘটিয়েছে? এই আইন সতর্কভাবে বিবাহের জন্য একটি বয়সসীমা নির্দিষ্ট করে দেয় বটে, কিন্তু এই বয়স সীমার নিচে (বিবাহ নিষিদ্ধ বয়সে) ছেলে-মেয়েদের অবৈধ যৌন কর্মের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করার বিষয়টি বেমালুম ভুলে যায়। অধিকাংশ মুসলিম দেশে আধুনিকতাবাদীরা কোরআন ও সুন্নাহর আইন লঙ্ঘন, বহুবিবাহ প্রথাকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, এমনকি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে।

প্রকৃতপক্ষে নারী স্বাধীনতাবাদের প্রবক্তারা নারীর ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার প্রতি আগ্রহশীল নয়। লাহোরে ‘নিখিল পাকিস্তান মহিলা পরিষদ’ আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে পরিষদের এক সক্রিয় সমর্থক জনাবা সাতনাম মাহমুদ তার বক্তব্যে সরলতার সাথে এ কথা স্বীকার করেন যে, যদিও পাশ্চাত্যের মহিলারা বস্তুগত প্রাচুর্য এবং সামাজিক পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম-অধিকার ভোগ করছে, তথাপি তারা কাঙ্ক্ষিত সুখে সুখী নয়। তিনি বলেন, যদি আত্মীক সুখই লক্ষ্য হয় তবে তার সমাধান তথাকথিত নারী স্বাধীনতার মধ্যে পাওয়া যাবে না। সুবিধাবাদী সমাজকর্মী এবং উক্ত মহিলা পরিষদের অন্যতম সদস্যা বেগম কাইসেরা আনোয়ার আলী তার বক্তব্যে যে সকল উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের বিষয়ে

এমনভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করেন যে, তাদের সংগঠন মেয়েদের এই উন্নাসিকতার যে সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক তা যেন তিনি জানেনেই না।

মুসলিম বিশ্বে নারী মুক্তি আন্দোলন সেই চরম পরিণতিই ডেকে আনবে যা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে এখন ঘটছে। যৌন বিষয়ে বিশ্বব্যাপী আজকের মানব সম্প্রদায় যে হারে ন্যাকারজনক আচরণে লিপ্ত হয়েছে তা বন্য পশুদের বিবেককেও হার মানায়। এই আচরণের অনিবার্জ পরিণতিতে সংসার ও পরিবার পদ্ধতিসহ সামাজিক সকল নৈতিকতার বন্ধন সম্পুর্নরূপে ভেঙ্গে পরবে এবং ব্যাপকভাবে কিশোর অপরাধ, দুর্নীতি, নির্যাতন, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আইনের কার্যকরীহীনতা দেখা দিবে। অতীতের সকল ইতিহাসই এর যথার্থ সাক্ষী যে, যখনই কোন সমাজে পাপ ও অনৈতিকতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে সে সমাজ আর বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি।

৫.৩ আধুনিক যুগে মুসলিম নারীর প্রকৃত সমস্যাসমূহ

বর্তমান যুগে মুসলিম নারীরা একদিকে বৈশ্বিক আধুনিকতা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও নৈতিক সংকটের মুখোমুখি, অন্যদিকে নিজেদের সমাজের কিছু ভুল প্রথা, ধর্মীয় অজ্ঞতা এবং সামাজিক বৈষম্যের শিকার। ফলে মুসলিম নারীর প্রকৃত সমস্যাগুলো অনেক সময় আড়ালে থেকে যায় এবং তার পরিবর্তে কৃত্রিম বা অতিরঞ্জিত কিছু বিষয়কে "নারীমুক্তি"র মূল ইস্যু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অথচ বাস্তবতা হলো—মুসলিম নারীর প্রধান সমস্যা ইসলাম নয়; বরং ইসলামের সঠিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুতি, সাংস্কৃতিক কুসংস্কার এবং আধুনিক ভোগবাদী সমাজব্যবস্থার চাপ।

ইসলাম নারীকে সম্মান, নিরাপত্তা ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রদান করলেও বাস্তব জীবনে সেই আদর্শ সর্বত্র প্রতিফলিত হচ্ছে না। নিম্নে আধুনিক যুগে মুসলিম নারীর প্রধান সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো—

১. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব ও ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা

বর্তমান মুসলিম সমাজের অন্যতম বড় সমস্যা হলো নারীদের মধ্যে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক সঠিক ইসলামী জ্ঞানের অভাব। অনেক নারী নিজের অধিকার, দায়িত্ব, মর্যাদা ও পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি জানেন না। ফলে

তারা কখনো সমাজের ভুল ব্যাখ্যার শিকার হন, আবার কখনো পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

সমাজের কিছু মানুষ সংস্কৃতি, কুসংস্কার বা ব্যক্তিগত মতামতকে ইসলামের বিধান হিসেবে উপস্থাপন করে। এর ফলে নারীদের শিক্ষাগ্রহণ, সামাজিক অংশগ্রহণ কিংবা মতামত প্রকাশকে নিরুৎসাহিত করা হয়। অথচ ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞানার্জনকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

এই ভুল ব্যাখ্যা ও অজ্ঞতার কারণে অনেক নারী মনে করেন ইসলাম তাদের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধক, যদিও বাস্তবে ইসলামই নারীকে সর্বপ্রথম সম্মান, উত্তরাধিকার, শিক্ষা ও নিরাপত্তার অধিকার দিয়েছে।

২. শিক্ষাবঞ্চনা ও দক্ষতার অভাব

অনেক মুসলিম সমাজে এখনো নারীদের শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিশেষ করে দরিদ্র ও রক্ষণশীল কিছু সমাজে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা বা দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সীমিত করে দেওয়া হয়। ফলে বহু নারী আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা অর্জন থেকে বঞ্চিত হন।

এর প্রভাব কেবল ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং পুরো পরিবার ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষার অভাবে নারী আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না, নিজের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হয় না এবং অনেক সময় সামাজিক শোষণের শিকার হয়।

ইসলাম নারীর শিক্ষাকে কখনো বাধাগ্রস্ত করেনি; বরং জ্ঞান অর্জনকে মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে। ইসলামের ইতিহাসে বহু নারী জ্ঞানচর্চা, হাদীস শিক্ষা ও সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই আদর্শ থেকে অনেক সমাজ দূরে সরে গেছে।

৩. কুসংস্কার, সামাজিক অবিচার ও পারিবারিক নির্যাতন

অনেক মুসলিম সমাজে কিছু অন্যায় সামাজিক প্রথাকে ধর্মের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যদিও সেগুলোর সাথে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ, যৌতুক, নারীর মতামত উপেক্ষা এবং পারিবারিক সহিংসতা এখনো বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান।

অনেক ক্ষেত্রে নারীকে পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না। কোথাও তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, কোথাও আবার ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের উপর অত্যাচারকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

অথচ ইসলাম নারীর প্রতি সদাচরণ, ন্যায়বিচার ও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।"

— (সূরা আন-নিসা ৪:১৯)

কিন্তু বাস্তবে ইসলামের এই ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করার কারণে বহু নারী মানসিক, সামাজিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

৪. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ

বর্তমান যুগে গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিনোদন শিল্পের মাধ্যমে পশ্চিমা জীবনধারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। এর ফলে অনেক মুসলিম নারী নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, সম্পর্ক ও জীবনদর্শনে পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। লজ্জাশীলতা, সংযম ও পারিবারিক মূল্যবোধকে অনেক সময় পশ্চাৎপদতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

এই অন্ধ অনুকরণের ফলে মুসলিম সমাজে নৈতিক দুর্বলতা, আত্মপরিচয়ের সংকট এবং ইসলামী মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। অনেক তরুণী বাহ্যিক আধুনিকতাকেই উন্নতির একমাত্র মানদণ্ড মনে করছে, অথচ আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।

৫. ভোগবাদী সংস্কৃতি ও নারীর পণ্যায়ন

আধুনিক বিশ্বে ফ্যাশন শিল্প, বিজ্ঞাপন ও বিনোদন জগতে নারীর দেহকে প্রায়ই পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। নারীর জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতার পরিবর্তে তার বাহ্যিক সৌন্দর্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

নারীবাদের কিছু ধারা "স্বাধীনতা"র নামে এমন এক সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করেছে যেখানে দেহপ্রদর্শন ও আত্মপ্রচারকে ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু বাস্তবে এর ফলে নারী আরও বেশি ভোগবাদী মানসিকতার শিকার হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের প্রতিযোগিতা নারীদের মধ্যে আত্মতুষ্টিহীনতা, মানসিক চাপ ও হীনমন্যতা সৃষ্টি করছে। অনেক নারী নিজের প্রকৃত মূল্যবোধ ভুলে বাহ্যিক স্বীকৃতির পেছনে ছুটছে।

৬. পর্দা ও শালীনতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি

বর্তমান সময়ে হিজাব ও শালীনতাকে অনেক সময় নারীর স্বাধীনতার বাধা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। পশ্চিমা চিন্তাধারা ও কিছু মিডিয়া প্রচারণার কারণে অনেক মুসলিম নারী পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না।

ফলে কেউ সামাজিক চাপে পর্দা ত্যাগ করে, আবার কেউ শুধুমাত্র পারিবারিক রীতির কারণে পর্দা পালন করে কিন্তু এর আত্মিক ও নৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে না।

এর প্রভাব সমাজেও দেখা যাচ্ছে। অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সম্পর্কের পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে এবং নারীকে বাহ্যিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে মূল্যায়নের প্রবণতা বাড়ছে। অথচ ইসলাম শালীনতাকে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে শিক্ষা দিয়েছে।

৭. কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা ও বৈষম্য

বর্তমান সময়ে বহু মুসলিম নারী শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও তারা বিভিন্ন ধরনের হয়রানি, বৈষম্য ও অনিরাপত্তার শিকার হন। অনেক ক্ষেত্রে নারীর যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিবর্তে তার বাহ্যিক দিককে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কিছু কর্মপরিবেশে শালীনতা ও নৈতিকতার অনুকূল পরিবেশ থাকে না, যা নারীদের মানসিক চাপ ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনেক নারী মাতৃত্ব ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনের কারণে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের সম্মুখীন হন।

ইসলাম নারীর কাজ করাকে নিষিদ্ধ করেনি; বরং নিরাপত্তা, মর্যাদা ও শালীনতা বজায় রেখে প্রয়োজনীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে।

৮. মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বর্তমান প্রজন্মের চিন্তাভাবনা ও জীবনধারার উপর গভীর প্রভাব ফেলছে। অনেক সময় এসব মাধ্যমে এমন জীবনধারা প্রচার করা হয় যেখানে জনপ্রিয়তা, সৌন্দর্য ও ভোগবাদকেই সফলতার মাপকাঠি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এর ফলে তরুণীদের মাঝে আত্মপ্রদর্শন, অনৈতিক সম্পর্ক, সময়ের অপচয় এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নষ্ট হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। অনেক নারী বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভার্চুয়াল স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে পারিবারিক দূরত্ব, মানসিক অস্থিরতা ও একাকীত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯. ইসলামি আদর্শবান নারী রোল মডেলের অভাব

বর্তমান যুগে মিডিয়ায় যেসব নারীকে সফলতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তাদের অধিকাংশের পরিচিতি মূলত ফ্যাশন, বিনোদন বা বাহ্যিক চাকচিক্যকেন্দ্রিক। ফলে তরুণীরা প্রকৃত আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অথচ ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু মহীয়সী নারী ছিলেন যারা জ্ঞান, চরিত্র, তাকওয়া, নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন—খাদিজা (রা.), আয়িশা (রা.) এবং ফাতিমা (রা.)।

বর্তমান প্রজন্ম এসব আদর্শ থেকে দূরে থাকার কারণে বাহ্যিক চাকচিক্য ও জনপ্রিয়তাকেই সফলতার মানদণ্ড মনে করছে।

১০. পরিবার ভাঙন ও নৈতিক সংকট

আধুনিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা পরিবারকে দুর্বল করে দিচ্ছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বিবাহবিমুখতা, অবাধ সম্পর্ক এবং পারিবারিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ধৈর্য ও দায়িত্ববোধ কমে যাচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হচ্ছে এবং সন্তানদের সঠিক মানসিক ও নৈতিক গঠন ব্যাহত হচ্ছে।

পরিবার ভাঙনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, একাকীত্ব বাড়ছে এবং মানসিক অস্থিরতা সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ ইসলাম পরিবারকে ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছে।

৫.৪ আধুনিক যুগে মুসলিম নারীর সংকট মোকাবিলায় করণীয়

- মুসলিম নারীদের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন। কারণ বর্তমান সময়ে অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে ইসলামের অপব্যাখ্যা, অজ্ঞতা এবং সাংস্কৃতিক কুসংস্কারের কারণে। তাই নারীদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যা সরাসরি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক। সমাজে ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। অনেক সময় সমাজের প্রচলিত কিছু ভুল রীতি ইসলামের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়, যা নারীকে তার

প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাই নারীকে ইসলামে প্রদত্ত অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।

- বিকৃত নারীবাদী আন্দোলন ও ইসলামি শরিয়াহবিরোধী নারী-অধিকারের দাবি উত্তোলনকারী প্রত্যেক প্রচেষ্টা, স্লোগান ও সংস্থার বিরুদ্ধে হিকমাহ ও প্রজ্ঞার সাথে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করা।
- বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য মুসলিম নারীদের এমন শিক্ষা প্রয়োজন যেখানে ইসলামী আদর্শ ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় থাকবে। নারীদের জন্য নিরাপদ, শালীন ও নৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা আত্মমর্যাদা বজায় রেখে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য পেশাগত দক্ষতা অর্জনে নারীদের উৎসাহিত করতে হবে, যেন তারা সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।
- কর্মজীবী নারীদের জন্য শরিয়াহবান্ধব পরিবেশ ও সেক্টরের ব্যবস্থা এবং তার দাবিকে জোরদার করা। পাশাপাশি এমন বোনদের বৈধ সেক্টরগুলোর প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং ইসলামি শরিয়াহ কর্তৃক নিষিদ্ধ সেক্টরগুলো থেকে বিমুখ করে তোলা।
- নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অনলাইন ও অফলাইনভিত্তিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা এবং এই ক্ষেত্রে দুটি পর্যায়ে কাজ করা। প্রথমত, ইসলামি শরিয়াহর প্রতি নারীর সম্মান ও গর্বকে ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত, নারীবিষয়ক সেকুলার, লিবারেল ও ফেমিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর অসারতা ও ভ্রান্তিকে সুস্পষ্ট করা।
- মুসলিম নারীদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু বোনদের তৎপর হওয়া উচিত, যারা আদর্শ ও ইলমি যোগ্যতায় উত্তীর্ণ। এ সমস্ত বোনরা মুসলিম তরুণীদের মাঝে ইসলামি শরিয়াহর বিধানগুলো আপসহীনভাবে হৃদয়ঙ্গম করে বোনদের সামনে তুলে ধরবেন। তারা প্রভাব বিস্তারকারী হবেন, প্রভাবিত হবেন না। তাদের বক্তব্য হবে সুস্পষ্ট, যেখানে থাকবে না পশ্চিমা সংস্কৃতির কাছে নতি স্বীকার। এর জন্য তারা সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম ব্যবহার করবেন। নারীদের জন্য বিশেষ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে তার আওতায় নারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করবেন।

- বিদ্যমান সমাজে নারীরা যেসব অন্যায় ও জুলুমমূলক আচরণের শিকার হয়, তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং ইসলামি শরিয়াহর বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং ইসলামি শরিয়াহর আলোকেই তার সমাধান বাস্তবসম্মতভাবে পেশ করা। বিশেষত নির্দিষ্টভাবে যেসব নারী এমন পরিস্থিতির শিকার, কল্যাণ ও সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের প্রতি হওয়া জুলুমকে নির্মূল করে তাদের জন্য ইনসাফ নিশ্চিত করা।
- মুসলিম তরুণীদের হায়া, তহারাত ও পর্দার ওপর প্রতিপালন করা। নারীত্ব ও মাতৃত্ব বিষয়ে ইলমি ও তরবিয়তি তৎপরতা বৃদ্ধি করা, যার মাধ্যমে নারীত্ব ও মাতৃত্বে তার ইবাদাত ও স্বভাবজাত দিকগুলো ফুটে উঠবে। বিশেষত মুসলিম নারীদের মাঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ও আনুগত্যকে গভীর করে তোলা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী, পরিবার ও ইসলামি মূল্যবোধভিত্তিক প্রতিযোগিতা, গবেষণা ও সৃজনশীল কার্যক্রম চালু করা।
- মুসলিম নারীদের জন্য জরুরি হলো, উপনিবেশবাদী ও প্রাচ্যবাদী সংস্থাগুলো তাদের ওয়েস্টার্নাইজেশন তথা পশ্চিমায়নের জন্য যত চক্রান্ত আবিষ্কার করেছে, সেগুলো ভালোভাবে চিনে নেওয়া এবং তাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে না দেওয়া।
- জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর যেই অসৎ উদ্দেশ্য, সেটাকে অনুধাবন করা। নিজের সন্তানদের সৎ ও সাহসী মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং সেজন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।
- নারীবাদী আন্দোলনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে জানা এবং এগুলোর ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলা।
- নারীদের নিয়ে প্রাচ্যবাদী গবেষণাসমূহের বিরুদ্ধে মুসলিমদের গবেষণা ও পর্যালোচনা তৈরি করা এবং সেগুলো মুসলিম নারীদের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া।
- মুসলিম দেশগুলোতে কেবল নারীদের জন্য বিভিন্ন সংঘ, ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। যারা মুসলিম নারীদের পশ্চিমায়নের হাত থেকে বাঁচাতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ইলমি প্রাচীর তৈরি করবে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত মুসলিম বোনদের নীড়ে ফেরানোর জন্য পলিসি প্রস্তুত করবে এবং আধুনিক নারীবাদী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে নারীদের ভেতর জাগরণ সৃষ্টি করবে।

- প্রত্যেক নারীকে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে তোলা। যাতে সে পরিবার গঠনে এবং পরিবারের ও সন্তানদের লালনপালনে উত্তম অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি তাদের সমাজের নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজের যোগ্য করে তুলতে হবে। কেননা আমাদের পরিবারগুলোকে, মায়েদের ও নারীদের তাদের প্রকৃত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পন্থা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর এই মহান সংস্কারমূলক কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই অধিকতর উপযোগী ও সক্ষম।
- বিশেষভাবে সমাজের পুরুষদের একটি দায়িত্ব হলো, নারীর পারিবারিক মর্যাদা নিশ্চিত করা। নারীকে পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শনের মতো নিছক উৎপাদক যন্ত্র হিসেবে না দেখা। বর্তমান সময়ে নারীদের পরিবার থেকে বের করার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হলো, পরিবারে তার অবদান খাটো করা। অর্থনৈতিকভাবে কিংবা উপার্জনের দিক থেকে তার অবদানকে মূল্যায়ন না করা। পুরুষদের এই জঘন্য মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেওয়া পুরুষকর্তৃক নারীর ওপর কোনো প্রকার অনুগ্রহ নয়; বরং এটা তার আবশ্যিক দায়িত্ব। যা মহান আল্লাহ তাআলা তার ওপর ধার্য করেছেন।
- বর্তমান যুগে ডিজিটাল মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনধারার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিনোদনমাধ্যম ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। অশ্লীলতা, অনৈতিক সম্পর্ক, আত্মপ্রদর্শন ও ভোগবাদকে উৎসাহিত করে এমন কনটেন্ট এর বিরুদ্ধে তৎপরতা তৈরি করতে হবে এবং যথাসম্ভব নিষিদ্ধ করতে হবে। বিশেষ করে তরুণীদের মাঝে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

অধ্যায়:৬: উপসংহার

৬.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ

নারীকে ঘিরে মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে নারী কোনো না কোনোভাবে অবমূল্যায়ন, বৈষম্য ও অধিকারবঞ্চনার শিকার ছিল। প্রাচীন রোম, গ্রীস, ইহুদী, খ্রিস্টীয় ও হিন্দু সমাজে নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান ছিল, তা নারীর মানবিক মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। এমন এক প্রেক্ষাপটে ইসলাম নারীকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সম্মান ও স্বতন্ত্র অধিকার প্রদান করে ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা করে। ইসলাম নারীকে কেবল পরিবারের অংশ হিসেবেই নয়; বরং সমাজ ও সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলাম নারীকে শিক্ষা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, মতামত প্রকাশ, বিবাহে সম্মতি, সামাজিক অংশগ্রহণ ও ন্যায়বিচারের অধিকার দিয়েছে। একইসাথে ইসলাম নারী-পুরুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের পার্থক্যকে স্বীকৃতি দিয়ে পরিবার ও সমাজে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে।

অন্যদিকে আধুনিক নারীবাদ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তুললেও এর বহু ধারা ধর্মীয় মূল্যবোধ, পারিবারিক কাঠামো ও নারী-পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্যের বিরোধিতা করেছে। এর প্রভাবে বর্তমান সমাজে পরিবার ভাঙন, নৈতিক সংকট, ভোগবাদ এবং নারীর পণ্যায়নের মতো বাস্তবতা ক্রমশ দৃশ্যমান হয়েছে। নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অনেক তাকে নতুনভাবে ভোগবাদী সংস্কৃতির উপকরণে পরিণত করেছে।

নারীদের উপর সমাজে যে শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনা সংঘটিত হয়, তা অবশ্যই বাস্তব এবং অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে এর সমাধান ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা, শরীয়াহভিত্তিক ন্যায়বিচার এবং নৈতিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে মুসলিম সমাজে নারীর যেসকল সমস্যা বিদ্যমান, তার জন্য দায়ী ইসলামের সঠিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুতি, কুসংস্কার, ধর্মীয় অজ্ঞতা ও সামাজিক অপচর্চা। অতএব বলা যায়, নারীবাদ যেখানে মানুষের কল্পিত স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করে, সেখানে ইসলাম মানুষকে আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমে প্রকৃত মর্যাদা, নিরাপত্তা ও মুক্তির পথ দেখায়। নারী-পুরুষ উভয়েই আল্লাহর বান্দা, এবং তাদের

প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের অনুসরণে। তাই বর্তমান যুগে নারীজাতির প্রকৃত সম্মান, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, নৈতিক আদর্শ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থাকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

তথ্যসূত্র

- আল-কুরআনুল কারীম
- সহীহ আল-বুখারী
- সহীহ মুসলিম
- জামে আত-তিরমিযী
- সুনান আবু দাউদ
- সুনান ইবনে মাজাহ
- সুনান আন-নাসাঈ
- মুসনাদে আহমদ
- মিশকাতুল মাসাবীহ
- আদাবুল মুফরাদ
- মুসতাদরাক আল-হাকিম
- মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা
- আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ — ইবনে হিশাম
- সিয়ার আ'লামিন নুবালা — ইমাম যাহাবী
- ইসলামে নারীর অধিকার— ডা. জাকির নায়েক
- ইসলাম ও আধুনিক মুসলিম নারী— মরিয়ম জামিলা
- ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী— ড. মুসতাফা আস সিবায়ী
- আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারী সমাজ— হাসসান বিন সাবিত
- ইসলামে নারী— আল বাহি আল খাওলী
- বিহাইন্ড ফেমিনিজম— মারিয়াম তানহা
- মুসলিম নারীর সংকট— ড. উমর সুলাইমান আশকার
- Sunnah.com — https://sunnah.com
- Quran.com — https://quran.com
- IslamQA — https://islamqa.info
- Alukah — https://www.alukah.net
- Islam House— https://islamhouse.com
- মাসিক আলকাউসার— https://www.alkawsar.com

- মাসিক আত-তাহরীক— https://at-tahreek.com
- মাসিক আল-ইতিছাম— https://al-itisam.com